শিল্প ও সংস্কৃতি

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে
কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমি হিমালয় দেখিনি
কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি,
ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায়
তিনিই হিমালয়"
— ফিদেল ক্যাস্ট্রো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মঞ্জুর আহমদ

তানজিল ফাতেমা

ড. মো: জাহিদুল কবীর

এগনেস র‍্যাচেল প্যারিস

শেখ নিশাত নাজমী

মো. আশরাফুজ্জামান

মোঃ হাসান মাসুদ

শাহ্ মোঃ জুলফিকার রহমান

সুলতানা সাদেক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ
রাসেল রানা

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রিয় শিক্ষার্থী

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ৩টি অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথম অভিজ্ঞতার নাম 'জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান'। এ অভিজ্ঞতায় আমাদের চিরচেনা পরিবেশ থেকে অনুসন্ধান করে তুলে আনব আমাদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনে নিজস্ব সংস্কৃতির নানা দিক। যা অনেক সময় আমাদের অজানাই থেকে যায়। আমাদের এই অনুসন্ধান আমরা নিজেদের পছন্দের মাধ্যমে শিল্পকলার যেকোনো শাখায় প্রকাশ করব।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার নাম 'বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়'। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব। এ যুদ্ধে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে সাথে শিল্পীরাও অংশগ্রণ করেছেন নিজেদের অবস্থান থেকে। সৃষ্টিশীলতা দিয়ে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সৃষ্টি করেছেন জনমত, করেছেন অনুপ্রাণিত। অনেক শিল্পী প্রত্যক্ষ ভাবে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য। বিদেশী শিল্পীবন্ধুরাও নিজেদের অবস্থান থেকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সহযোগীতা করেছেন। তাঁদের অবদান সর্ম্পকে জানতে আমাদের এ অভিজ্ঞতা সাজানো হয়েছে।

তৃতীয় অভিজ্ঞতার নাম 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী'। নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতির গৌরবগাঁথা সর্ম্পকে জানা, পাশাপাশি বিশ্ব শিল্পের কালজয়ী সৃষ্টি সম্পর্কে জেনে তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করা। এরই ধারাবাহিকতায় নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে একদিন আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরব। সেই প্রত্যাশা প্রকাশ করা হয়েছে।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখাসহ শিল্পকলার যে শাখায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, সে শাখায় ইচ্ছেমতো আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারব এবং শিল্পের আনন্দ উপভোগ করতে শিখব। এর চর্চার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সে নান্দনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গর্ব আর আত্ম-ত্যাগের সকল ইতিহাসকে জেনে অন্তরে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখব 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়টির মধ্য দিয়ে।

সূচিপত্র

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ফুলিঙ্গ, ৩৪

পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যকে দেখা, জানা ও উপভোগের জন্য আমরা অনেক জায়গায় ভ্রমণ করি। নতুনকে জানা আমাদের সারা জীবনের প্রত্যাশা। নতুন নতুন দেশ ও অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, সবকিছু দেখে, জেনে উপভোগ করার জন্য আমরা দূর-দূরান্তে ছুটে যাই। প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানার এই ব্যাকুলতার মধ্যে আমাদের চারপাশের জিনিসগুলোর দিকে অনেক সময় দৃষ্টি দেওয়া হয় না, থেকে যায় অজানা। প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য যেমন সব সময় চোখ মেলে দেখা হয়ে ওঠে না, ঠিক তেমনি আমাদের পাশে বাস করা প্রতিবেশী সম্পর্কে জানা হয়ে উঠে না। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি নিয়ে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, তেমনি চারপাশে যে মানুষজন রয়েছে, তাদের নিয়ে আমাদের সামাজিক পরিবেশ। আমাদের পাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সমাজে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন, ঘর-বাড়ি, আচার-আচরণ, ভাষা, খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় উৎসব, রীতিনীতি, শিল্পকলা, (চিত্রকলা, সংগীত, নাট্য, নৃত্য, আবৃত্তি প্রভৃতি) সাহিত্য ও ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন: বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি।

বস্তুগত সংস্কৃতি

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য ব্যবহৃত সকল বস্তুগত উপাদানকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে। এসব বস্তুগত উপাদানের ঘরবাড়ি, আসবাব, পোশাক, তৈজসপত্র, হাতিয়ার ইত্যাদি অন্যতম।
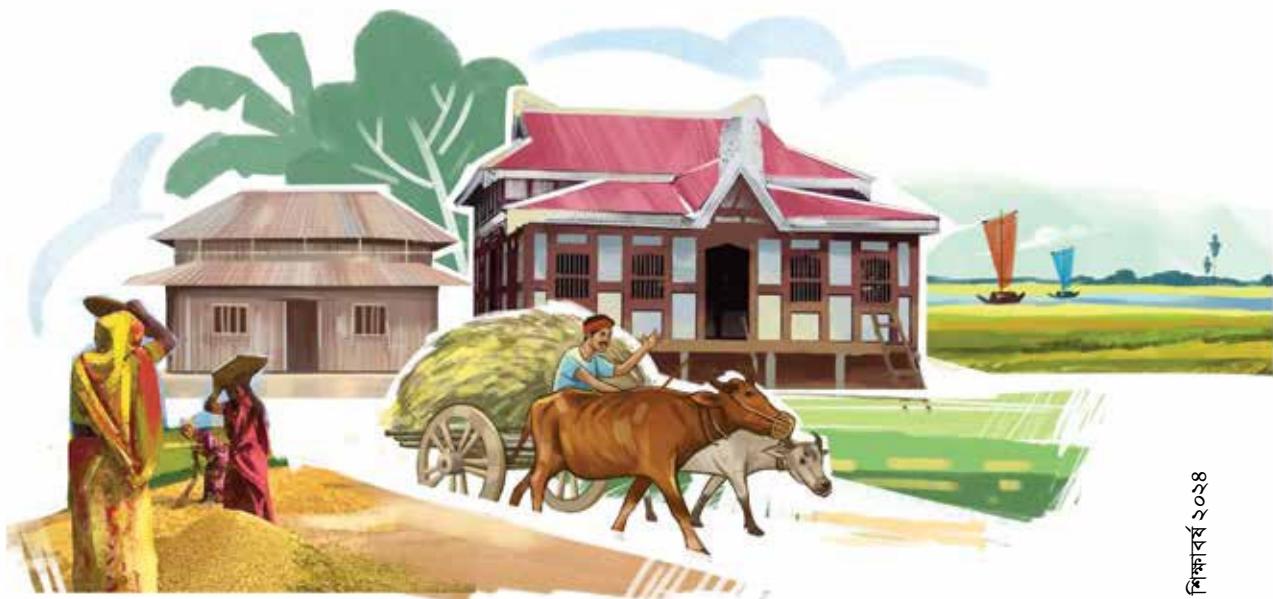
অবস্তুগত সংস্কৃতি

যেসব বিষয়ের বস্তুগুণ নেই, অথচ আমাদের চিন্তাশীল জীবনযাপনের অংশ, সেটিকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেমন: দর্শন, ধর্ম, ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার বিচিত্র আঙ্গিক, আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য, নীতিবোধ, আইন, প্রথা, অভ্যাস ইত্যাদি।

খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উপাদানের ধরন শহর এবং গ্রামের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যেও এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাই বিশ্ব সংস্কৃতিকে জানতে হলে আগে নিজের সংস্কৃতিকে জানতে হবে। একই দেশের জাতিগোষ্ঠী ভেদে সাংস্কৃতিক ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে হবে। সকল জাতিগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যকে সম্মান জানাতে হবে।

গ্রামীণ সংস্কৃতি

নগর সংস্কৃতি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি

এবার, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের চারপাশের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানগুলোর সাহায্যে নিজের এলাকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। আমাদের এই কাজটার নাম হবে 'জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান'। কাজটি করার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি দল গঠন করব এবং দলের সৃজনশীলতাকে উপস্থাপনের জন্য প্রতিটি দলের একটি শিরোনাম ঠিক করব।

দলের পরিবেশনা ও প্রদর্শনীর জন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টির জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার সময় যেসব বিষয় চিন্তায় রাখতে হবে তা হলো-

যে এলাকায় আমরা বর্তমানে বসবাস করছি এবং যে স্কুলে পড়ালেখা করছি, তার চারপাশটা দেখতে কেমন তা ভালোভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। এলাকার মানুষজনের আচার, আচরণ, খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্রের ধরন ও নকশা, বিভিন্ন পেশাসহ দৈনন্দিন জীবন যাপনের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান ভালোভাবে অবলোকন করতে হবে।

নিজের এলাকায় ধর্মীয় সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের মানুষ কীভাবে নিজেদের ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, আশুরা, ঈদে-মিলাদুন্নবী(সা:), শবেকদর, দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী পূজা, কালীপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, বুদ্ধপূর্ণিমা, মধুপূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, মাঘী পূর্ণিমা, বড়দিন, ইস্টার সানডে, জন্মদিন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, মেলা, গায়েহলুদ, বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি উদ্‌যাপন করে এবং সে সময় কী কী আয়োজন থাকে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। এই সব উৎসবের সময় পোশাকের ধরন, খাবারের আয়োজন, গৃহসজ্জা, এলাকা সজ্জার ধরন এবং উপকরণের ব্যবহার, মেলায় বিক্রি করতে আনা পণ্যের নকশা, ধরন ও উপকরণের ব্যবহার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীদের পরিবেশন করা গান, নাচ, অভিনয়সহ সকল পরিবেশনার এবং মঞ্চসজ্জার ধরন ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করে সেসব তথ্য-উপাত্ত লিখে, নকশা এঁকে, রাখতে হবে।

ঈদুল ফিতর

দুর্গাপূজা

বুদ্ধপূর্ণিমা

বড়দিন

এছাড়া নিজের এলাকায় বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন: ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস সহ সকল জাতীয় দিবস কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়, তাতে কী কী আয়োজন এবং পরিবেশনা থাকে তার বর্ণনা লিখে, ছবি এঁকে, রাখতে হবে।

এলাকায় বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ, বর্ষা উৎসব, নবান্ন উৎসব, পৌষ মেলা, বসন্ত বরণসহ সকল উৎসব কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়, তার ধরন, তাতে কী কী আয়োজন এবং পরিবেশনা থাকে, তার বিবরণ লিখে, ছবি এঁকে, রাখতে হবে।

গ্রামের বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ

শহরের বর্ষ বিদায় এবং বর্ষবরণ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ

এই পাঠে যেভাবে আমরা কাজের অভিজ্ঞতা পাব:

নিজের এলাকার সংস্কৃতির এসব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের তথ্য উপাত্তের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা গভীর ধারণা পাব। এবার নিজের অঞ্চলের বাইরে বাকি যে দুটি সাংস্কৃতিক ধরন রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন উৎস যেমন: বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সংবাদ, প্রামাণ্য চিত্র, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমরা একটা স্বচ্ছ ধারণা পাব। তারপর সংস্কৃতির এসব উপাদানকে কাজে লাগিয়ে আমরা সৃষ্টি করব আমাদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম।

দলের পরিবেশনা ও প্রদর্শনীর জন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেভাবে আমরা কাজটা করব:

- প্রথমে আমরা শ্রেণির সকল সহপাঠী সমান সংখ্যায় ভাগ হয়ে আটটি দল গঠন করব।
- নিজেরাই দলগুলোর নাম রাখব।
- প্রথমে যে এলাকায় আমরা বর্তমানে বসবাস করছি, তার অবস্থান কি গ্রামে, শহরে অথবা পার্বত্য এলাকায় তা শনাক্ত করে লিপিবদ্ধ করব।
- এবার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের এলাকার সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করব এবং একটা তালিকা তৈরি করব।
- নিজের অঞ্চলটি যদি গ্রামে হয়, তবে তা সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করব। বাকি দুটি সংস্কৃতি যেমন: শহরের সংস্কৃতি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সংবাদ, প্রামাণ্য চিত্র, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জানব এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করব।
- নিজের অঞ্চলটি যদি শহরে অথবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংবলিত এলাকায় হয়, তবে উপরের নির্দেশনার মতো নিজের এলাকাটি সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করব। বাকি দুটি সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করব।
- নিজের অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা অন্য দুটি সাংস্কৃতির উপাদানগুলোর তুলনামূলক ছক তৈরি করব।

ছকের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ

গ্রাম-সংস্কৃতি	নগর-সংস্কৃতি	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি
নির্ধারিত গ্রামের ঘরবাড়ির ধরন কেমন।	নির্ধারিত শহরের ঘরবাড়ির ধরন কেমন।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঘরবাড়ির ধরন কেমন।
নির্ধারিত গ্রামের মানুষের খাবার এবং পোশাকের ধরন কেমন।	নির্ধারিত শহরের মানুষের খাবার এবং পোশাকের ধরন কেমন।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের খাবার এবং পোশাকের ধরন কেমন।
নির্ধারিত গ্রামের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান পালনের ধরন কেমন।	নির্ধারিত শহরের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান পালনের ধরন কেমন।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান পালনের ধরন কেমন।
নির্ধারিত গ্রামের মানুষের করা চারু ও কারুকলা, নাচ, গানসহ স্থানীয় শিল্পকলার ধরন ও আয়োজিত অনুষ্ঠান বা পরিবেশনার ধরন কেমন।	নির্ধারিত শহরের মানুষের করা চারু ও কারুকলা, নাচ, গানসহ স্থানীয় শিল্পকলার ধরন ও আয়োজিত অনুষ্ঠান বা পরিবেশনার ধরন কেমন।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের করা চারু ও কারুকলা, নাচ, গানসহ স্থানীয় শিল্পকলার ধরন ও আয়োজিত অনুষ্ঠান বা পরিবেশনার ধরন কেমন।
নির্ধারিত গ্রামে আয়োজিত বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ আয়োজনের ধরন কেমন।	নির্ধারিত শহরে আয়োজিত বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরনণ আয়োজনের ধরন কেমন।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আয়োজিত বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরনণ আয়োজনের ধরন কেমন।
নির্ধারিত গ্রামের উল্লেখযোগ্য মেলা বা উৎসবের বিবরণ।	নির্ধারিত শহরে উল্লেখযোগ্য মেলা বা উৎসবের বিবরণ।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য মেলা বা উৎসবের বিবরণ।
নির্ধারিত গ্রামে জাতীয় দিবসগুলো পালনের আয়োজনের ধরন কেমন।	নির্ধারিত শহরে জাতীয় দিবসগুলো পালনের আয়োজনের ধরন কেমন।	নির্ধারিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জাতীয় দিবসগুলো পালনের আয়োজনের ধরন কেমন।

- উপরের নমুনা ছকের মতো করে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার কাজটি সম্পন্ন করব।
- এবার দলের প্রত্যেক সদস্যের তৈরি করা ছকগুলোর তথ্য-উপাত্তগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলাব।
- সবার তথ্যগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তগুলো নিয়ে দলের প্রর্দশনী এবং পরিবেশনার একটা থিম বা বিষয় ঠিক করব। বিষয়টি তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি দলের কোন সদস্য কী প্রদর্শন বা পরিবেশন করবে তার তথ্য লিখে একটি পোস্টার তৈরি করব। পোস্টারটি নিজেদের বিষয়ের সঙ্গে মিল রেখে অলংকরণ করব এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করব।
- দলের সদস্যদের মধ্য থেকে আগ্রহী সদস্যরা প্রদর্শনী বা পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করব, আগেই প্রত্যেক সদস্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে নেব কোন সদস্য কী পরিবেশন বা প্রদর্শন করব।
- দলের মধ্যে যারা পরিবেশন/প্রদর্শন করবে না তারা আয়োজক/সংগঠকের ভূমিকা পালন করব। যারা দলের সমগ্র আয়োজনটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করব।
- এবার দলের প্রদর্শনী বা পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা নিজেদের তৈরি দলীয় বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ইচ্ছেমতো মাধ্যমে ছবি এঁকে, নকশা করে, ক্যালিগ্রাফি করে, কোনো কিছু গড়ে বা বুনে, গান গেয়ে, নাচ করে, অভিনয় বা আবৃত্তির সৃজনশীল উপস্থাপন করব।
- প্রতিটি দলের পরিবেশনার পরে নির্দিষ্ট দলের উপস্থাপনা ও প্রদর্শনীর বিষয়ে বাকি দলের সদস্যরা তাদের গঠনমূলক মতামত জানাব।

এভাবে আমরা নিজের অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানব এবং তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষার চেষ্টা করব।

গ্রাম, শহর এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে তার সঙ্গে তৈরি করেছে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য।
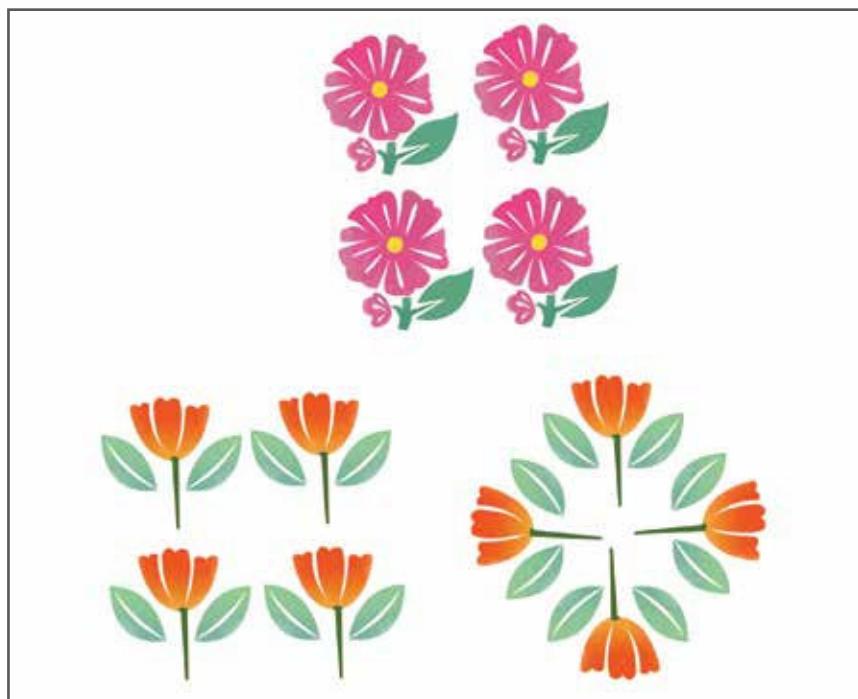
এই পাঠে আমরা যে অভিজ্ঞতা পাব:

এবার আমরা ছবি আঁকার একটি নিয়মনীতি সম্পর্কে জানব, ছবি আঁকার ভাষায় যাকে বলা হয় ঐক্য (Unity)।
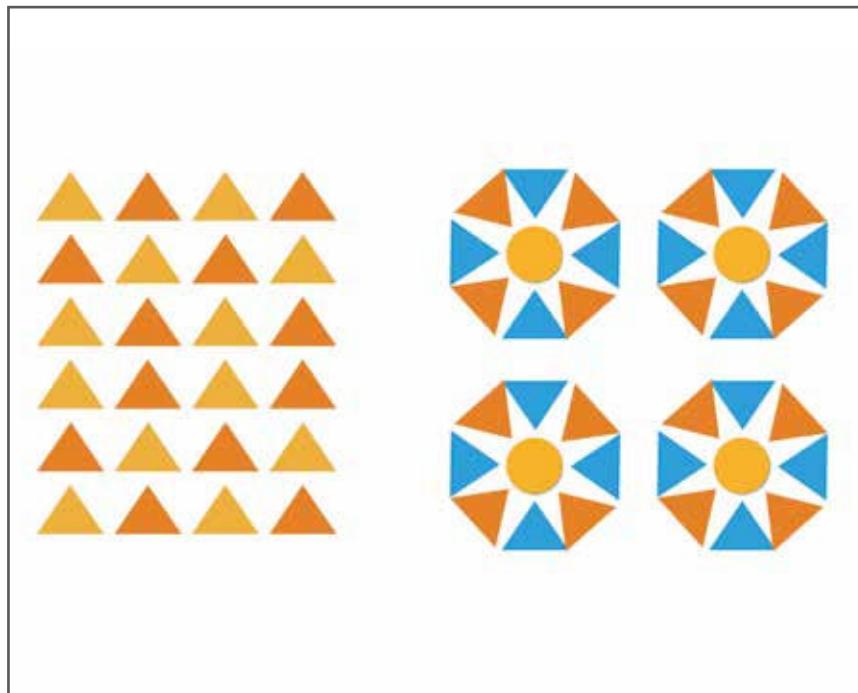
ঐক্য:

ছবিতে বিভিন্ন উপাদানের সুশৃঙ্খল উপস্থাপনকে ছবি আঁকার ভাষায় ঐক্য বলে। ছবির উপাদানগুলো হলো- রেখা, আকৃতি, গড়ন, রং, পরিসর, আলোছায়া, বুনট। ছবি আঁকার নিয়মনীতি অনুসরণ করে এক বা একাধিক উপাদানকে যথাযথভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ছবিতে ঐক্য ফুটিয়ে তোলা হয়।

প্রাকৃতিক আকৃতি দিয়ে ঐক্য

জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে ঐক্য

সংগীতে স্বরের ঐক্য তৈরির জন্য সাতটি শুদ্ধ স্বর-এর সঙ্গে আরো চারটি কোমল স্বর ও একটি কড়ি স্বর রয়েছে। দুটি পদ্ধতিতে স্বরলিপি লেখা হয় যেমন– ভাতখন্ডে ও আকারমাত্রিক। আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে সাতটি শুদ্ধ স্বর লেখা হয় এভাবে– স, র, গ, ম, প, ধ, ন। র, গ, ধ, ন এই চারটি স্বরের আবার কোমল স্বর রয়েছে। কোমল স্বরগুলো লেখার নিয়ম হচ্ছে–র কে লেখা হয় ঋ, গ কে লেখা হয় জ্ঞ, ধ কে লেখা হয় দ, ন কে লেখা হয় ণ এর মতো করে। 'ম' স্বরের কড়ি স্বর লেখা হয় হ্ম। ভাতখন্ডে পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানব।

শুদ্ধ ও কোমল, কড়ি স্বরের ঐক্যের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় সুর। তাই সংগীত সাধনার জন্য শুদ্ধ স্বরের পাশাপাশি কোমল ও কড়ি স্বরের আরোহণ অবরোহণ চর্চা করা দরকার।

এবার আমার 'গ' এর কোমল স্বর যাকে সংগীতের ভাষায় লেখা হয় 'জ্ঞ' তার সারগাম চর্চা করব।

২. জ্ঞ স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চা

আরোহণ–স র জ্ঞ ম প ধ ন র্স

অবরোহণ–র্স ন ধ প ম জ্ঞ র স

শিল্পকলার প্রতিটি শাখায় যেমন বৈচিত্র্য আছে, তার পাশাপাশি আছে ঐক্য। তেমনিভাবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। আমরা নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সেটিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান জানাব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব

- আমাদের চারপাশে বসবাস করা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি নিয়ে ইচ্ছেমতো মাধ্যমে ছবি এঁকে, নকশা করে, ক্যালিগ্রাফি করে, কোনো কিছু গড়ে বা বুনন করে দলের থিমকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ও ধর্মীয় সম্প্রীতিকে তুলে ধরে বিভিন্ন উৎসবের ছবি ইচ্ছেমতো মাধ্যমে এঁকে, নকশা করে, ক্যালিগ্রাফি করে, কোনোকিছু গড়ে বা বুনন করে অথবা গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি শাখার মধ্য থেকে যেকোনো একটি শাখায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের থিমকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।
- বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক গ্রাম-সংস্কৃতি, শহরের সংস্কৃতি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আয়োজনের রূপকে ইচ্ছেমতো মাধ্যমে এঁকে, নকশা করে, ক্যালিগ্রাফি করে, কোনোকিছু গড়ে বা বুনন করে অথবা গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি শাখার মধ্য থেকে যেকোনো একটি শাখায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের থিমকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।
- থিম অনুযায়ী দলের প্রদর্শনী এবং পরিবেশনার সকল আয়োজন সুষ্ঠুভাবে ও পরিকল্পনা অনুসারে করব।
- ঐক্যের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া উদাহরণ দেখে অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া 'জ্ঞ' স্বরের ব্যবহারে সারগাম অনুশীলন করব।

পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দানে পাওয়া নয়
দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি
জানা আছে জগৎময়।।
সতেরোশো সাতান্ন সনে
ভাইবা দেখেন পড়বে মনে,
দাম দিছি পলাশীর মাঠে
ইতিহাস তার সাক্ষী রয়।।
সেইবারে জানিল বিশ্ব
আমরা কত ধনীরে

দান করিতে লক্ষ জীবন
তুচ্ছ বলে গণি রে।
আঠারো শো সাতান্ন সালে
দাম দিছি ফের জানে মালে,
পিছন ফিরে চাইলে পরে
একশ বছর কথা কয়।।
উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের
চৌদ্দই আগস্ট রাতে রে
ব্রিটিশ গিয়া সইপ্যা গেল
জল্লাদেরই হাতে রে।
তারা মোদের খুন কইরাছে
নানা অযুহাতে রে।
লক্ষ করুণ হাসি' হাসি'
খাইছে গুলি পরছে ফাঁসি,
তবু না দুঃখিনী বাংলা
তোমার আমার কারো হয়।।
বায়ান্নোতে মুখের ভাষা
কিন্‌ছি বুকের খুনে,
বরকতেরা রক্ত দিছে
বিশ্ব অবাক শোনে।
দিছি রক্ত জন্মাবধি
সাগর-সাগর, নদী-নদী
রক্তে বাংলা লাল কইরাছি
এই কথা তো মিথ্যা নয়।।
উনিশ শো একাত্তর সালে
পঁচিশে মার্চ রাতে
সর্বহারা করছে আমায়
পশ্চিমা ডাকাতে।
বাপের সামনে বলুক তো ঝুট

মেয়ের ইজ্জত হয়নি কি লুট?
দুঃখে বাংলার পদ্মা মেঘনা
যমুনা যে উজান বয়।।
দাম দিয়েছি মায়ের অশ্রু
বোনের সম্ভ্রম রে,
বলতে কি কেউ পারো তোমরা
সে দাম কারো কম রে?
কত কুলের কুলাঙ্গনা
নাম নিয়াছি বীরাঙ্গনা
আজো বাংলার আকাশ বাতাস
তারই শোকে উদাস হয়।।
দাম দিয়াছি বুদ্ধিজীবী
নামী দামি লোক কত,
এই জন্মে কি ফুরাবে ভাই
আমার বুকের সেই ক্ষত?
উনিশ শো একাত্তর সালে
ষোলেই ডিসেম্বর সকালে
অবশেষে দুঃখিনী এই
বাংলা মা যে আমার হয়।।

গীতিকার ও সুরকার: আব্দুল লতিফ

বাংলার বীর জনতা যুগে যুগে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে। ইতিহাস পূর্বকাল থেকে এই ভূখণ্ডের মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথে অগ্রগামী হয়েছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এই দেশের মুক্তিকামী মানুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের বীর জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে এই দেশের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল সৃজনশীল মানুষ। এসব সৃষ্টিশীল মানুষ নিজেদের মেধা মননসহ সৃজনশীলতা দিয়ে সকল আন্দোলন, সংগ্রামের পথকে করেছে গতিশীল। এবার আমরা ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্পী, সংগীতশিল্পী, অভিনয় ও নৃত্যশিল্পীদের অবদান সম্পর্কে জানব।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে

চারুশিল্পীদের অবদান

ভারতবর্ষ জুড়ে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে অবশেষে এল ১৯৪৭ সাল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন দেশের জন্ম হলো যার একটি ছিল ভারত, অন্যটি পাকিস্তান। তৎকালীন পাকিস্তান দেশটি ছিল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যার একটি পূর্ব পাকিস্তান যা বর্তমানে বাংলাদেশ, অন্যটি হলো পশ্চিম পাকিস্তান।

নতুন সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউট'। এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, তাঁর সঙ্গে আরো সম্পৃক্ত ছিলেন আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমেদ, সফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমীন, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পী।

'সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউট' পর্যায়ক্রমে 'পূর্ব পাকিস্তান সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়', 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়', 'চারুকলা ইনস্টিটিউট - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অনুষদ 'চারুকলা অনুষদ'- এর পরিচয় লাভ করে। এই শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণ ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় এবং ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। এই সময় শিল্পী মূর্তজা বশীর, শিল্পী ইমদাদ হোসেন প্রমুখ শিল্পী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্য নির্মিত শহিদ মিনারের নকশা প্রণয়ন করেন শিল্পী হামিদুর রহমান ও ভাস্কর নভেরা আহমেদ। ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছিল রমনার বটমূলে । বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণে ছায়ানটের এই বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডুসহ কিছু নবীন শিল্পী। চারুশিল্পীদের আয়োজনে ১৯৬৮ সাল থেকে শহিদ মিনারে অঙ্কন ও লিখনের সমন্বয়ে রাজনৈতিক বার্তা বহনকারী ব্যানার প্রদর্শিত হয়েছিল। একই বছর থেকে চারুশিল্পীরা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে শহিদ মিনারের সামনের রাজপথে আলপনা আঁকার রীতি প্রবর্তন করেন।

চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হয় শিল্পী রশিদ চৌধুরী হাত ধরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে চট্টগ্রামে নানা আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এসব আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শিল্পী রশিদ চৌধুরী, শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, শিল্পী মিজানুর রহিম, এছাড়া শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, শিল্পী শাহ মোহাম্মদ আনসার আলী, শিল্পী এনায়েত হোসেন, শিল্পী সবিহ উল আলম প্রমুখ শিল্পীরা যাঁরা সে সময়ে চারুকলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন সবাই মিলে লিথোগ্রাফে বা ছাপচিত্রে করা একটি পোর্টফোলিও বা সংকলিত চিত্রমালা প্রকাশ করেন। সে সময় এই পোর্টফোলিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

১৯৬৯ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ অনেক শিল্পীর আঁকা প্রতিবাদী চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল শহিদ মিনারে। গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিতে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী প্রমুখ শিল্পীর পরিকল্পনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ব্যানার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উত্তাল এই সময়গুলোতে চারুকলার হোস্টেল ছিল রাজনৈতিক পোস্টার ও ফেস্টুন লেখার মূল কেন্দ্রবিন্দু। হোস্টেলবাসী ছাত্রদের সিদ্ধান্তে এ সময় হোস্টেলের ছাদ থেকে একতলা পর্যন্ত বড় মাপের একটি ব্যানার ঝোলানো হয়েছিল। শিল্প-সমালোচক আবুল মনসুরের রচিত ‘স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন, ঐক্য আমার শক্তি, মুক্তি আমার লক্ষ্য’ কথাটি ব্যানারে লেখা হয়েছিল। তাছাড়া এ সময় শিল্পী রফিকুন নবীর উদ্যোগ, সম্পাদনা ও অলংকরণে প্রকাশিত হয়েছিল উনসত্তরের ছড়া নামে একটি প্রতিবাদী সংকলন।

১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে শহিদ মিনারে শিল্পীদের প্রতিবাদী উপস্থাপনা আগের বছরের তুলনায় আরো ব্যাপকতা লাভ করে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব ‘হিলাল-ই-ইমতিয়াজ’ প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এ সময় শিল্পীরা গঠন করে ‘বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ’। ১৬ মার্চ তারিখে বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ ‘স্বাধীনতা’ শীর্ষক একটি মিছিলের আয়োজন করে। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ 'স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি মিছিলের আয়োজন করে। ২৩ মার্চ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে কামরুল হাসানের আঁকা ইয়াহিয়ার দানবমূর্তি শীর্ষক কার্টুন সংবলিত কিছু পোস্টার প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হয়। শিল্পী কামরুল হাসান মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাতিরপুল এলাকার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সেনা দল চারুকলার হোস্টেলে প্রবেশ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, সেখানে তাদের হাতে শহিদ হন আর্ট কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র শাহনেওয়াজ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ঢাকায় নিজের বাসায় থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেন। সে সময় দেশের অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতেই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আঁকেন 'মুক্তিযোদ্ধা' শীর্ষক চিত্রকর্মটি।

১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ বাস্তবতায় জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম 'মুক্তিযোদ্ধা' ছবি: সংগৃহীত

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে কলকাতায় কামরুল হাসানের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে গড়ে ওঠে আর্ট ও ডিজাইন বিভাগ। এ বিভাগে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুণ্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, জহির আহমদ, হাসান, বীরেন সোম প্রমুখ শিল্পী। এসব শিল্পীর সৃষ্টি করা মুক্তিযুদ্ধের কিছু কালজয়ী পোস্টার মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি করে। এর মধ্যে কামরুল হাসানের আঁকা ইয়াহিয়ার দানবীয় মুখাকৃতির পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে
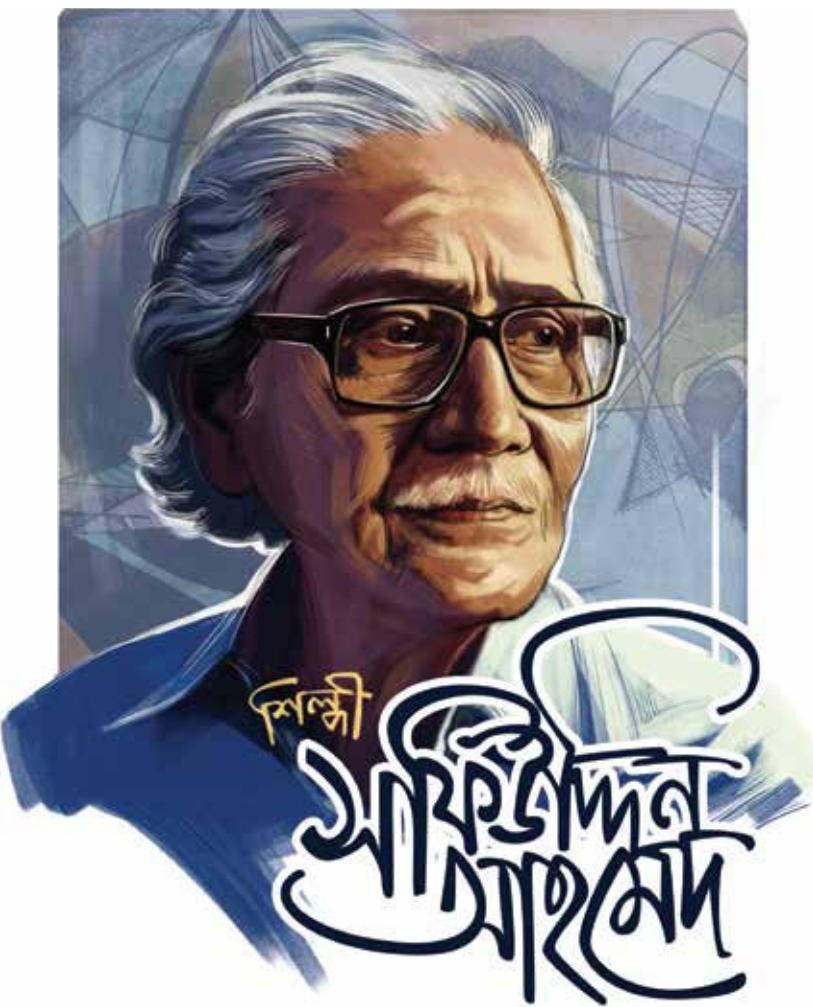
হবে’। শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর আঁকা ‘সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী’ শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডলের ‘বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা’, এবং শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা ‘বাংলার হিন্দু বাংলার খ্রিষ্টান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি’ ইত্যাদি পোস্টারগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সে সময় কলকাতার বিড়লা একাডেমিতে বাংলাদেশের শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, মুস্তাফা মনোয়ার, নিতুন কুণ্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস, বীরেন সোম, স্বপন চৌধুরী, কাজী গিয়াস, চন্দ্রশেখর দে, রণজিৎ নিয়োগী, হাসি চক্রবর্তীসহ ১৭ জন শিল্পীর ৬৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই প্রদর্শনী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বে জনমত তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৯৭১ সালে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গেরিলা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিল্পী সৈয়দ আবুল বার্‌ক্ আলভী। এসময় তিনি ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের মতো সাহসী শিল্পীরা সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শিল্পী স্বপন চৌধুরী একদল সংগীতশিল্পী সঙ্গে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সংগীত পরিবেশন করেন। এ সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের চিত্রমালা রচনা করেন। এছাড়া আবদুর রাজ্জাক, আবদুল খালেক, বনিজুল হক, মো. সিরাজুদ্দিনসহ অসংখ্য শিল্পী ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অনেক শিল্পী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে লড়াকু ‘মুক্তিযোদ্ধা’র গতিময় প্রাণবন্ত রূপকে নিজের চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এসময় কলকাতায় থাকা অবস্থায় শিল্পী কামরুল হাসান কালো কালিতে আঁকেন ‘মুক্তিযোদ্ধা’ ও ‘নারী মুক্তিযোদ্ধা’ শীর্ষক চিত্রগুলো। সে সময় ঢাকার আতঙ্কজনক পরিস্থিতি নিজে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী সময়ে নিজের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন সফিউদ্দিন আহমেদ। তাছাড়া এস এম সুলতান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, রশীদ চৌধুরী, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, শাহাবুদ্দিন আহমেদসহ অসংখ্য শিল্পীর কাজেই মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এভাবে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পাশাপাশি চারুশিল্পীরা নিজেদের মেধা, মনন, সৃষ্টিসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ ধরে আজ অবদি বাংলাদেশের চারুশিল্পীরা তাঁদের ভাবনা এবং মননে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আছে। আগামীতেও বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের শিল্পকর্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রকাশিত হবে স্বমহিমায়।

এবার আমরা বাংলাদেশের একজন শিল্পী সম্পর্কে জানব যিনি শিল্পকর্মে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কালের নিজের অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার জগতে শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ এক অনন্য শিল্পী ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯২২ সালের ২৩ জুন কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁকে বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জনক বলা হয়। ছাপচিত্রের পাশাপাশি তিনি জলরং, তেল রং-সহ অনেক মাধ্যমে শিল্পকর্ম রচনা করে বাংলাদেশের শিল্পকলার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের শিল্পকলার জগতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁকে 'শিল্পগুরু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ ১৯৩৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪২ সালে সেখান থেকে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি যুক্তরাজ্যের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস্ থেকে এচিং ও এনগ্রেভিং বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে একসঙ্গে ঢাকা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।

১৯৩৬-৪১ সালের মধ্যে সফিউদ্দিন আহমেদ বিহারের মধুপুর, দেওঘর, জেসিডি, গিরিডি, চাইবাসা, ঝাঝা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে ছবি আঁকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালে তিনি গিয়েছেন সাঁওতাল পরগনার দুমকা অঞ্চলে। দুমকা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আঁকা চিত্রমালা শিল্পী হিসেবে তাঁকে গুরুত্বপূর্ন করে তোলে। আর্ট স্কুলে ফাইন আর্ট বিভাগে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি জলরং ও তেলরঙে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি উড এনগ্রেভিং মাধ্যমটিও গভীরভাবে রপ্ত করেন।
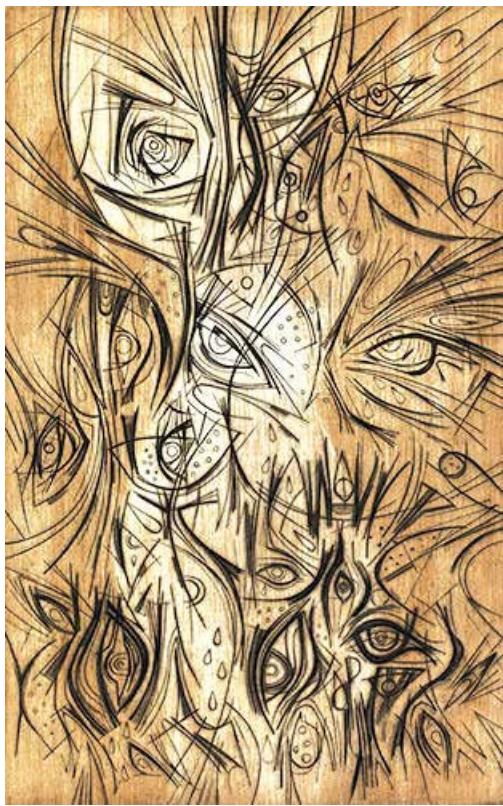
নব্বইয়ের দশকে তিনি রেখাচিত্রে ছবি০ আঁকেন যা 'ব্ল্যাক সিরিজ' বা 'কালো চিত্রমালা' নামে পরিচিত। তার শিল্পকর্মে ১৯৫২ বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ছবি উঠে এসেছে বিভিন্ন মাধ্যমে। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'বদ্ধ মাছ' শীর্ষক চিত্রে মাছের চোখটি তার বদ্ধাবস্থাজনিত প্রতিবাদ প্রকাশ করছে। আশির দশকে তিনি সরাসরি চোখের মোটিফ ব্যবহার করে আঁকলেন 'কান্না', 'একুশে স্মরণে', 'একাত্তরের স্মৃতি', 'একাত্তরের স্মরণে' শীর্ষক শিল্পকর্ম। এসব শিল্পকর্মে শিল্পী ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের স্মৃতিকে তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশের শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৮ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৫ সালে 'বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলো' মনোনীত হন এবং ১৯৯৬ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯ মে ২০১২ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।
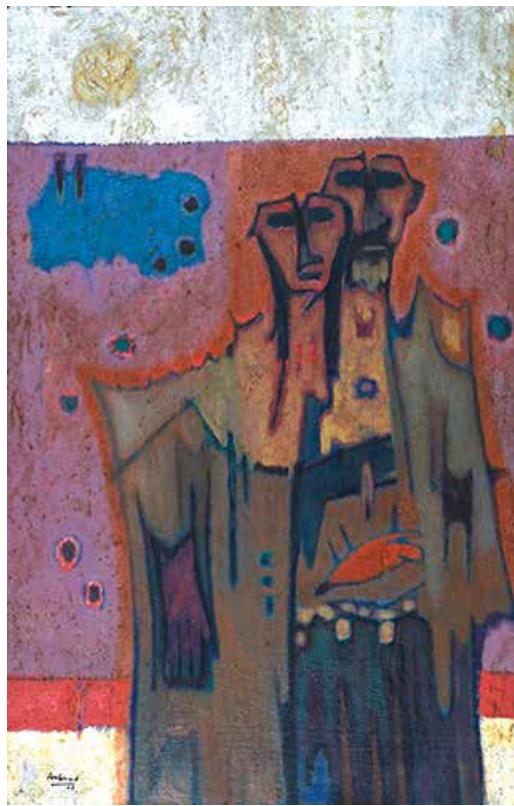
শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের কিছু শিল্পকর্ম

'মেলা পথে- ১', মাধ্যম: কাঠখোদাই, ১৯৪৭, ছবি: সংগৃহীত

'৭১ এর স্মৃতি' ছাপচিত্র, ১৯৮৮, ছবি: সংগৃহীত

'শরনার্থী' তেলচিত্র, ২০০৫, ছবি: সংগৃহীত

'মাছ ধরার সময় – ১', ছাপচিত্র, ১৯৬২, ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে
সংগীত শিল্পীদের অবদান

যুগে যুগে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে সংগীতের অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, যন্ত্রশিল্পীসহ সকলের সৃষ্টিই প্রেরণা দিয়েছে সংগ্রামী মানুষকে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আমাদের সকল সংগ্রামে শক্তির অন্যতম উৎস। তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ছড়িয়ে দিয়েছে অনুপ্রেরণা আর এগিয়ে যাওয়ার শক্তি।

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার হে!
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।।

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ–
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত।
কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত,

এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।
তিমির রাত্রি, মাতৃ-মন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারি, আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম'—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন,
কাণ্ডারি, বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।।
গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ—
পশ্চাৎ পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারি, তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি'—নিয়েছ যে মহাভার।।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জবিনের জয়গান—
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান!
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ,
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।।

—কাজী নজরুল ইসলাম

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নানাভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টায় রত, সেই সময়ে সে অপচেষ্টা প্রতিরোধকল্পে নানা সংগঠন গড়ে ওঠে। যেমন: পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, সংস্কৃতি সংঘ, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি। সংগঠনগুলো সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা, দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত, নাটক মঞ্চায়নসহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করত। এই সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রক্ষা ও পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করা ছিল মূল উদ্দেশ্য। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর অনুষ্ঠিত হয় অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সম্মেলন। পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন: চট্টগ্রাম, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন; কুমিল্লা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর আসে ১৯৫২ সাল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন এই দেশের ছাত্র-জনতা। যা ছিল ভাষা আর সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন। মাতৃভাষা যেকোনো জাতির স্বকীয়তা আর সংস্কৃতির প্রধান রূপ। তাই তো ছাত্র-জনতা, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী, বাংলার সর্বস্তরের মানুষের দাবি ছিল মাতৃভাষা বাংলাকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত রোধ করতেই হবে।

মাতৃভাষা আন্দোলনের শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ প্রথম রচিত একুশের গান 'ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না আর একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না' গানটি রচনা করেন ভাষাসৈনিক আবু নছর মোহাম্মদ গাজীউল হক, গানটিতে সুর করেন নিজাম উল হক।

পরবর্তী সময়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর সাড়া জাগানো একুশের গানটি লেখেন, যা বেনামে প্রকাশিত হয়-

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।

১৯৫৪ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় সংকলন গ্রন্থে গানটির গীতিকারের নাম প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান সরকার এই সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে। এ গানটিতে প্রথম সুরারোপ করেন আব্দুল লতিফ। পরবর্তী সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ মাহমুদ গানটিতে পুনরায় সুরারোপ করেন, যে সুরটি এখনো গাওয়া হয়। এই গানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের আবেগ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

সে সময় একুশে ফেব্রুয়ারির আরেকটি গান রচনা ও সুর করেন শিল্পী, গীতিকার, সুরকার আব্দুল লতিফ। 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' ।

এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সালে ঢাকার ওয়াইজ ঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয় বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা)। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর নামে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী হয়। এই উদ্‌যোগে বাফার বিরাট ভূমিকা ছিল। এ উদ্‌যাপন কেবল শতবর্ষ উদ্‌যাপন নয়, বরং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলা সংস্কৃতি অন্যতম ধারক রবীন্দ্রনাথকে এদেশে নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এক সাহসী পদক্ষেপ ছিল।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ১৯৬৩ সালে বাঙালি সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছায়ানট' নামে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখে, প্রতিষ্ঠানটির সে সময়ের সভাপতি ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। ছায়ানটের

উদ্যোগে ১৯৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল রমনার বটমূলে শুরু হয় বৈশাখ উদ্‌যাপনের ধারা, যা আজ অবধি প্রতি বছর চলছে।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় জনপ্রিয় হয় আলতাফ মাহমুদের লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুর করা গান–'ঝঞ্ঝা-ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক, ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক'। ১৯৭০ সালে জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে স্বৈরাচার পাকিস্তানি শাসকের শোষণের প্রতীকী রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রের গানগুলো তখন মানুষের মনে প্রতিবাদী চেতনাকে জাগ্রত করায় ভূমিকা রাখে।'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি',আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ,আমি কি ভুলিতে পারি', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'এ খাঁচা ভাঙ্গব আমি কেমন করে' অন্যতম।

১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ চলাকালে ফজল এ খোদার লেখা 'সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম, চলবে দিনরাত অবিরাম' গানটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া এসময়ে সর্বশ্রেণির শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত হয় বিক্ষুব্ধ 'শিল্পী সমাজ'। এই সংস্থার শিল্পীরা পাকিস্তান সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে গণহত্যার রাত পর্যন্ত গান গেয়েছেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী জনতাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলার জনগণকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংগীতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস। তাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের অবদানকে জানা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান জানানোর আমাদের কর্তব্য। এবার আমরা একটা কাজের পরিকল্পনা করব।

এই পাঠে আমরা যেভাবে কাজটা করব:

প্রথমে আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। অন্তত একটি নির্বাচিত গান, শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারদের নাম জানার চেষ্টা করব। এসব তথ্য-উপাত্ত আমরা বিভিন্ন উৎস যেমন: বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সংবাদ, প্রামাণ্য চিত্র, ছবি, ভিডিও, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করব। এই অধ্যায়ের শেষে 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' অনুষ্ঠান করব। শ্রেণি অনুষ্ঠানে গীতিকার ও সুরকারদের নামসহ দলগত ভাবে গান পরিবেশন করব।

গান গেয়ে যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা, সাধারণ মানুষের মনে আশার আলো জাগানোর পাশাপাশি আরো অনেকভাবেই সংগীতের সঙ্গে জড়িত এই মহান শিল্পীরা যুদ্ধ করেছেন। দেশে থেকে শিল্পী আব্দুল লতিফ, সুরকার রাজা হোসেন খান , যন্ত্রসংগীত শিল্পী হাফিজুর রহমান প্রমুখ শিল্পী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গান লেখা,সুর দেওয়া, রেকর্ড করার কাজ করেছেন প্রতিমুহূর্তে। সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করতেন। গেরিলারা তাঁর বাসায় আসতেন। অস্ত্র রাখতেন। একপর্যায়ে হানাদাররা তাঁকে বন্দী করে এবং টর্চার সেলে নিয়ে টর্চার করে। সে অবস্থায় তিনি শহিদ হন। আব্দুল

আহাদ তাঁর পদক ফিরিয়ে দেন পাকিস্তান সরকারের বর্বরতার প্রতিবাদে। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠী, স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘের শিল্পীরা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিকামী মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন। তাছাড়া অনেক সংগীতশিল্পী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিজেদের মেধা, শ্রম, সৃজনশীলতা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সংগীতশিল্পীদের এই অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

এবার আমরা এমন একজন সংগীত ব্যক্তিত্বের কথা জানব, যার সৃষ্ট সংগীত মা, মাটি, দেশের কথা আর সুরের ধ্বনি বেজে উঠত। তিনি হলেন সংগীত স্রষ্টা সমর দাস।

সুর স্রষ্টা সমর দাস

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের জন্য যেসব সুর স্রষ্টা সংগীতের মাধ্যমে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে সমর দাস অন্যতম। তিনি একাধারে সংগীতশিল্পী, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী এবং সংগীত পরিচালক। বাংলাদেশের অসংখ্য চলচ্চিত্র ও নৃত্যনাট্যে তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। জনপ্রিয় এই সুরস্রষ্টা ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জিতেন্দ্রনাথ দাস ও মাতা কমলিনী দাস। পারিবারিকভাবেই সংগীতে তিনি প্রথম শিক্ষা পান। পিতার ছিল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসা এবং তিনি ছিলেন সে সময়ের নামকরা পিয়ানো টিউনার। বাল্যকালে তিনি পিতার কাছেই প্রথম বেহালা বাদন শেখেন। এরপর নর্থফিল্ড নামের একজন মিশনারির কাছে পিয়ানো, গিটার ও বাঁশি বাজানো শেখেন। সংগীতপিপাসু বাবার ইচ্ছাতেই সমর দাস একসময় সংগীতের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েন। ১৯৪৫ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি অল-ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রে বংশীবাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কলকাতা বেতার ও গ্রামোফোন কোম্পানিতেও তিনি যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন।

দেশ ভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার বিষয়ে সমর দাসের ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর থেকে পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও প্রধান সংগীত পরিচালক ছিলেন। সমর দাসের সুর করা এবং গোবিন্দ হালদার রচিত 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' গানটি মুক্তিবাহিনীকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এছাড়া তাঁর সুর করা 'নোঙ্গর তোলো তোলো, সময় যে হলো হলো' 'চিরদিন মিশে আছে' 'ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে' গানগুলো সে সময়ের মতো এখনো মানুষকে সমানভাবে আন্দোলিত করে। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' আমাদের জাতীয় সংগীতকে সুরবিন্যাস করে বিবিসি লন্ডন থেকে সামরিক ব্রাশ ব্যান্ডের পরিবেশনায় রেকর্ড করার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। ১৯৭০ সালে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে এদেশের দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য 'কাঁদো বাঙালি কাঁদো' নামে একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমর দাস ছিলেন সে অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সংগীতে অবদানের জন্য তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশে পদক' এবং স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়েছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।
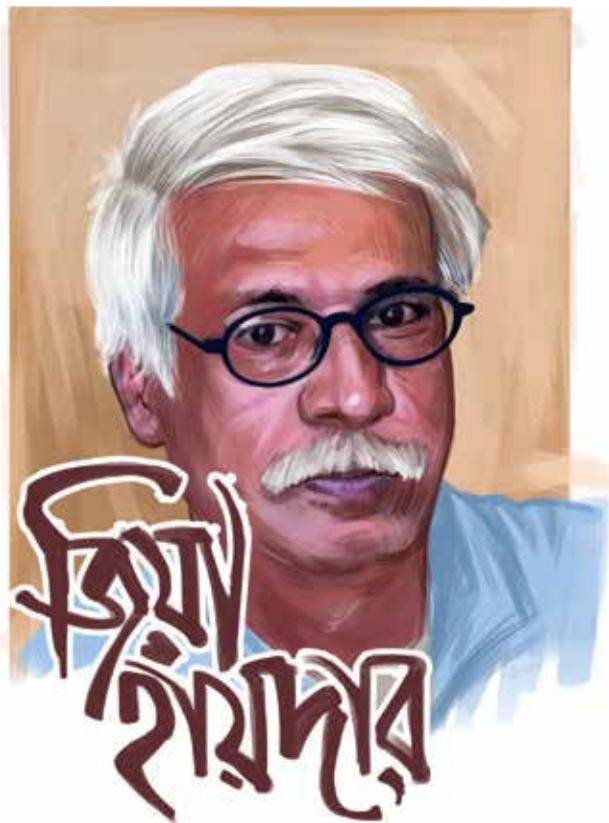
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে

অভিনয়শিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের অবদান

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলার শিল্পীরা গড়ে তোলেন 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'। এই সংস্থার আহ্বায়ক ছিলেন অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম। ৬ মার্চ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার জন্য শপথ করে। সেদিন মিছিল শেষে কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, চলচ্চিত্র ও নাটকের পরিচালক, সাংবাদিক, সংবাদকর্মী, চারুশিল্পীসহ প্রায় অর্ধশত বিক্ষুব্ধ শিল্পী আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প করে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এরই ধারাবাহিকতায় অসহযোগ আন্দোলনের একপর্যায়ে পাকিস্তান সরকার ৮ মার্চ থেকে রেডিও-টেলিভিশনের দায়িত্ব বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য সেসময় রেডিও-টেলিভিশনে রেকর্ডিং ব্যবস্থা সীমিত ছিল। সব অনুষ্ঠানই লাইভ সম্প্রচার হতো। ফলে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর শিল্পীদের নিয়ন্ত্রণে সেসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ এবং সৃজনি লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পথ নাটক মঞ্চস্থ করেন। এসব নাটকে গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ হাসান ইমাম, ড. ইনামুল হক, রওশন জামিল প্রমুখ অভিনয় করেন।

চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান তাঁর চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান সরকারের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলেন। যার ফলে বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতো তাঁকে গুম করা হয়। চলচ্চিত্র পরিচালক ও মঞ্চনাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ক্র্যাক প্লাটুনের গেরিলা হিসেবে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

নৃত্যশিল্পীরাও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নৃত্যশিল্পী মিনু বিল্লাহ। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত চলে যান ও ২ নম্বর সেক্টরের অধীন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নার্স হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষার কাজ করেছেন। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে দেশের অভিনয়শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, পরিচালক, নির্দেশকসহ আপামর শিল্পী সমাজ মুক্তিযুদ্ধপূর্ব, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অবদান রেখেছেন।
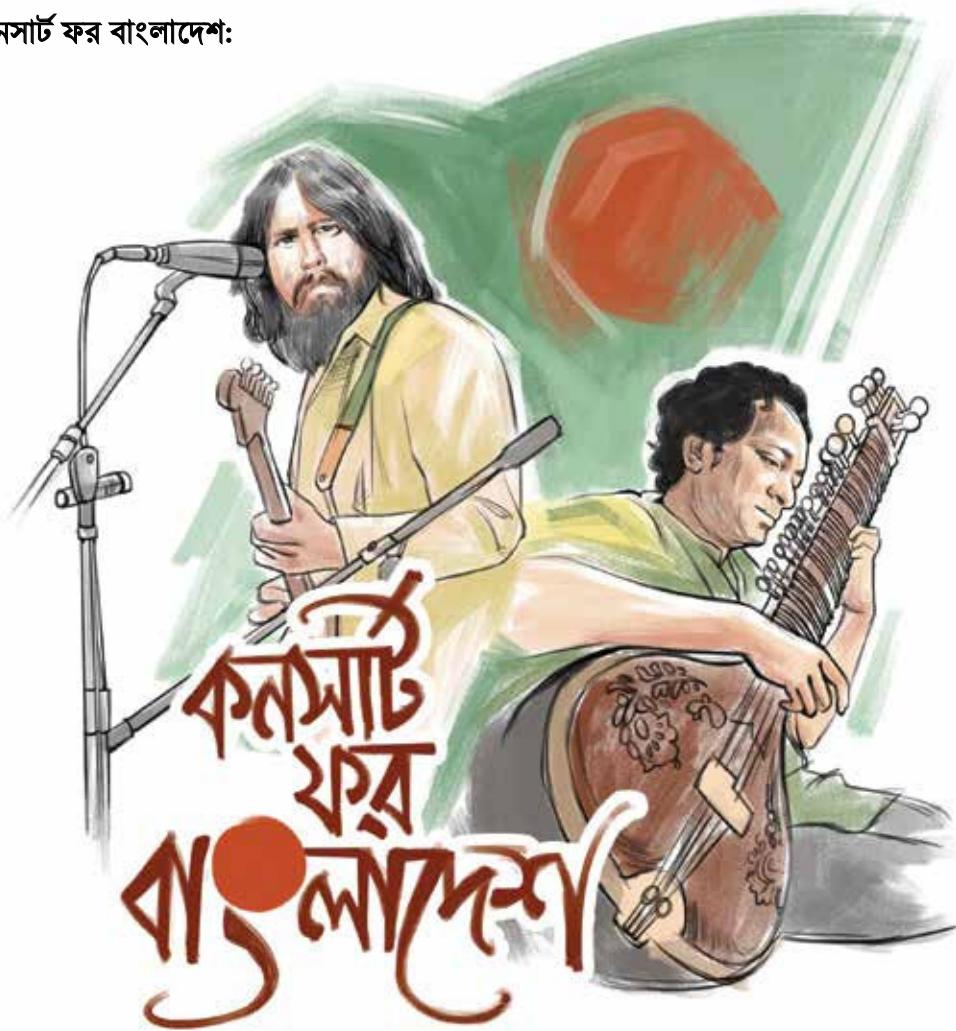
শেখ ফয়সাল আব্দুর রউফ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন হায়দার তাঁর পুরো নাম হলেও তিনি জিয়া হায়দার নামে পরিচিত। বাংলাদেশের নাট্য চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন জিয়া হায়দার। তিনি ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলার ওপর পড়াশোনা করেন এবং নাট্যকলায় এম এফ এ ও সার্টিফিকেট ইন শেক্সপিয়ার থিয়েটার ডিগ্রি লাভ করেন। সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্ম জীবন শুরু করলেও মূলত তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার, লেখক, অনুবাদক, নাট্য নির্দেশক, নাট্য সংগঠক ও অধ্যাপক। ১৯৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে নাট্যকলার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। নাট্যকলা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। মাঝে কিছুকাল তিনি বাংলা একাডেমি এবং তৎকালীন টেলিভিশনে সিনিয়র প্রডিউসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি থিয়েটার গ্রুপের নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস নামের একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্য বিষয়ক তাঁর বেশ কিছু গবেষণাধর্মী নিবন্ধ রয়েছে যা দেশ-বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলায় পড়ানো হয়। তাঁর ৭টি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, ৪টি রূপান্তরিত নাটক, বেশ কিছু অনূদিত নাটক এবং মৌলিক নাটক রয়েছে। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে 'সাদা গোলাপে আগুন' ও 'পংকজ বিভাস' এ দুটি নাটক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। ১৮ নভেম্বর ১৯৩৬ সালে পাবনা জেলায় জিয়া হায়দার জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে মারা যান। তিনি ১৯৭৭ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০০১ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি শিল্পী বন্ধুদের অবদান

বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, নারী সকলেরেই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এছাড়াও দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বাঙালিরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরিতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। সামরিক অঙ্গনের বাইরে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রকলার মাধ্যমে প্রতিদিন মানুষকে উজ্জীবিত করার নিরন্তর চেষ্টা চলেছে। তবে সব কিছুর মধ্যে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যুক্ত করেছিল বিদেশি বন্ধুদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরিতে বিদেশি বন্ধুদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের এসব বিদেশি বন্ধুর অবদান বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন স্মরণ করবে। এবার আমরা তেমন কিছু বিদেশি শিল্পীবন্ধু এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানব, যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ:

ষাটের দশকে আমেরিকার বিখ্যাত সংগীতদল বিটলসের অন্যতম সদস্য ছিলেন জর্জ হ্যারিসন। তাঁর সঙ্গে উপমহাদেশের বিখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। একাত্তরে বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন হ্যারিসন ও রবিশঙ্কর লস অ্যাঞ্জেলসে 'রাগা' নামে একটি অ্যালবামে কাজ করছিলেন। রবিশঙ্কর একদিন হ্যারিসনের কাছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপরে চলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। সে সময়ে তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের মানুষের অসহায়ত্ব, শরণার্থী, যুদ্ধ, বন্যা ইত্যাদির খবর সংগ্রহ করে হ্যারিসনকে দেখান এবং অসহায় এই মানুষের জন্য কিছু একটা করা উচিত বলে পরামর্শ দেন। রবিশঙ্কর নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত, গৃহহীন মানুষের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি মিউজিক্যাল কনসার্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, এখান থেকে অন্তত পঁচিশ হাজার ডলার সংগ্রহ করা। এরপর প্রায় তিন মাস ধরে হ্যারিসন-রবিশঙ্কর এরিক ক্লাপটনসহ সবার সঙ্গে কথা বলে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের জন্য কাজে লেগে পড়েন।

দিনটি ছিল রবিবার, ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে দুই পর্বে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বেলা আড়াইটায় এবং রাত আটটায়। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ আল্লারাখা, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, কমলা চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া এরিক ক্লাপটন, বব ডিলান, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, রিংগো স্টারের সঙ্গে পুরো অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন হ্যারিসন নিজেই। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সরোদ বাদন, পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার এবং ওস্তাদ আল্লারাখার তবলা বাদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যেখানে তানপুরা বাজিয়েছিলেন কমলা চক্রবর্তী। সেদিন ম্যাডিসন স্কয়ারে দর্শক ছিল কানায় কানায় ভরা। পরিকল্পনার শুরুতে একাধিক অনুষ্ঠান করার কথা না ভাবলেও দর্শক চাহিদার কারণে একই দিনে তাঁরা দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই কনসার্ট শেষে মোট আয় হয় দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত আঠারো ডলার পঞ্চাশ পেনি। এই অনুষ্ঠানের পুরো আয় চেকের মাধ্যমে বাংলাদেশের শরণার্থী শিশুদের সাহায্যার্থে ইউনিসেফের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এদিন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরা যে আয়োজন করেছিলেন, এটির অ্যালবাম পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হলে, তা বিখ্যাত গ্র্যামি পুরস্কার অর্জন করেছিল। আর্থিক সহায়তা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা বিশ্বে বিশাল জনমত গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শিল্পীদের এই আয়োজন, পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ তৈরি করতে বাংলাদেশের মানুষকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবদান:

ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে কলকাতায় সলিল চৌধুরী ও গণনাট্য সংঘের অসংখ্য গান মুক্তিবাহিনীকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারতের বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, বাপ্পী লাহিড়ীসহ একটি সাংস্কৃতিক দল বোম্বে, গোয়া, কানপুর, পুনেসহ বিভিন্ন স্থানে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীরা যৌথভাবে কলকাতার পার্ক সার্কাস মাঠ, রবীন্দ্রসদন, জোড়বাগান পার্ক, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এসব অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন।

ভারতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায়, গণেশ পাইন প্রমুখ শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।
অন্নদাশঙ্কর রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, প্রণব রঞ্জন রায়, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, ড. ফুলরেণু গুহ, দিলীপ বসু, ইলা মিত্র, রমেন মিত্র, আবদুর রহমান, ডা. গণি, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তার জন্য সর্বোচ্চ অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবর প্রচার, প্রতিবেদন ও জনমত তৈরিতে ‘আকাশবাণী কলকাতা’ ও তার কলাকুশলীদের অবদান অনন্য।

এছাড়া ব্রিটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সাহসী বিদেশি বন্ধু। ১৯৭১ সালে তিনি কলম আর ক্যামেরা হাতে মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার সরজমিন প্রতিবেদন তৈরি করে বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিলেন। তাছাড়া ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক টালি, লেয়ার লেভিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখেন। মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ রচনা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরিতে বিশাল অবদান রাখেন। এ রকম অসংখ্য বিদেশি সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পৃথিবীতে রয়েছে অনেক দেশ, জাতি আর সংস্কৃতির মানুষ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে শোষক শ্রেণি, তেমনি আছে মুক্তিকামী মানুষ। সংগ্রামী মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে পৃথিবীর মানবমুক্তির ইতিহাস। যুগে যুগে এই সব মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে সহযোগিতা করার জন্য ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অন্য দেশ, জাতি আর সংস্কৃতির কিছু মানবিক মানুষ। এসব সংগ্রামী আর মানবিক মানুষ পরস্পর মিলে রচনা করেছেন শোষণহীন নতুন পৃথিবী। ১৯৭১ সালে তেমন অনেক বিদেশি বন্ধুর ভালোবাসার হাত আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের করেছিল অনুপ্রাণিত পাশাপাশি আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে করেছিল গতিশীল। বাংলাদেশের মানুষ এসব বন্ধুর কথা চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

এই পাঠে আমরা যা অনুশীলন করব:

ভুবন জোড়া বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ, জাতি সংস্কৃতির মানুষ মিলেমিশে যেমন শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরি করে তেমনি ছবি আঁকার অন্যান্য নিয়মনীতির সঙ্গে ‘বৈচিত্র্য’ (Variety) চিত্রকে আর্কষণীয় করে তোলে। এবার আমরা জানব ,ছবি আঁকার নিয়মনীতি ‘বৈচিত্র্য’ (Variety) সম্পর্কে।
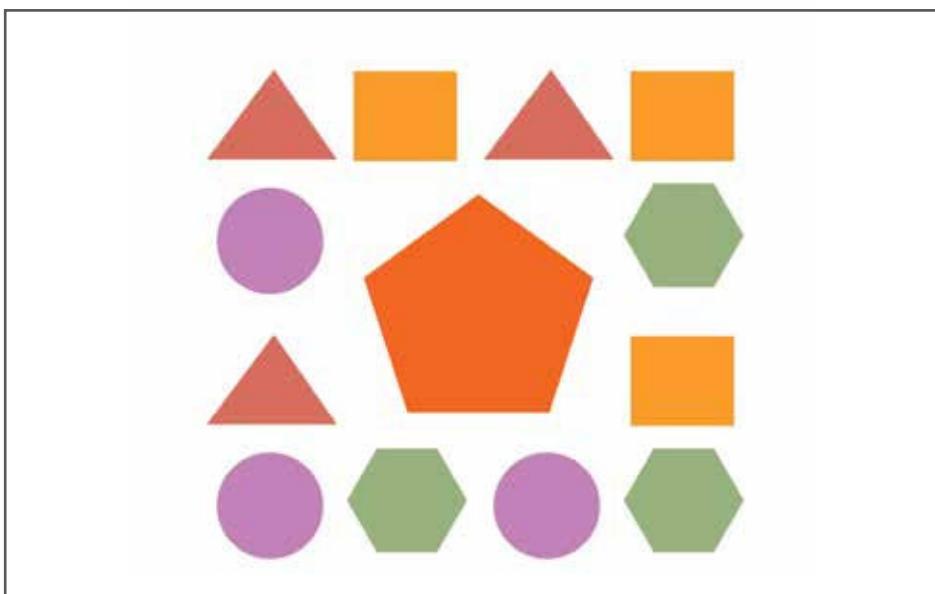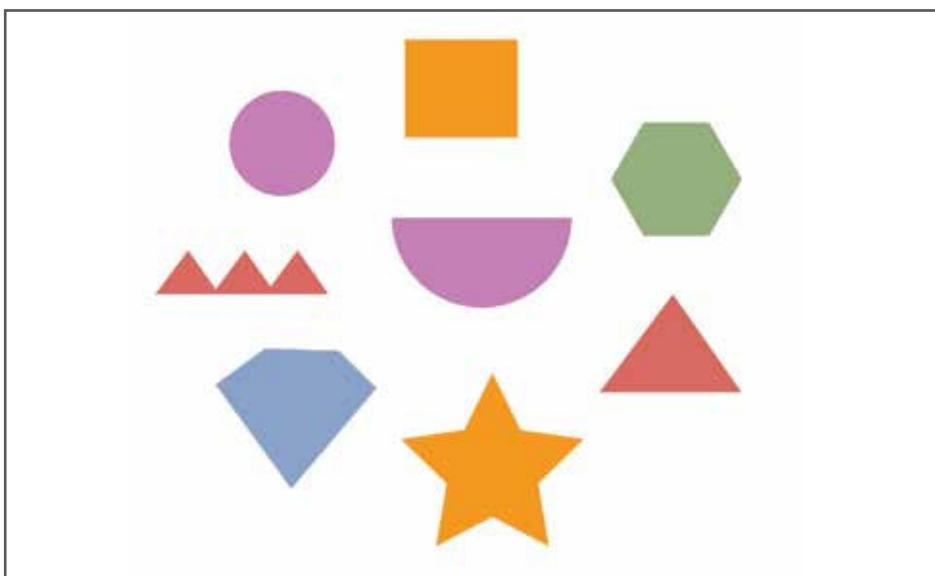
বৈচিত্র্য (Variety)

চিত্রকে আকর্ষণী করার জন্য তাতে বিপরীতধর্মী উপাদান ব্যবহার করাকে ছবি আঁকার ভাষায় বৈচিত্র্য (Variety) বলে। ছবির উপাদানগুলো হলো—রেখা, আকৃতি, গড়ন, রং, পরিসর, আলোছায়া ও বুনট। ছবি আঁকার নিয়মনীতি অনুসরণ করে এক বা একাধিক উপাদানকে নানাভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ছবিতে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয়। অর্থাৎ একই উপাদান একইভাবে বারবার ব্যবহার না করে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে ছবিতে বৈচিত্র্য প্রকাশ করা হয়।

বৈচিত্র্য (Variety) প্রাকৃতিক আকৃতি

বৈচিত্র্য (Variety) জ্যামিতিক আকৃতি

বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পকলার জগতে ছবি আঁকার নিয়মনীতির মতো অভিনয় ও নাচের ক্ষেত্রেও আছে নিয়মনীতি। তেমনি একটি হলো মস্তকসঞ্চালন। এবার আমরা অঙ্গগত অভিনয়ের মস্তক সঞ্চালন সম্পর্কে জানব।

মস্তকচলন: অঙ্গগত অভিনয়ের সময় মস্তকের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করাকে মস্তকচলন বলে। কোনো গান বা অভিনয়ের অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করা হয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে মস্তকচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আকম্পিত

ধীর গতিতে মাথা উপর-নিচ করাকে আকম্পিত মস্তকচলন বলে। সম্বোধন করা, কাছে ডাকা, উপদেশ দেওয়া, জিজ্ঞেস করা, নির্দেশ দেওয়া, হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে আকম্পিত মস্তকচলন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।উপর-নিচ নিচ-উপর

ধীর গতিতে উপর-নিচ ধীর গতিতে উপর-নিচ

কম্পিত

দ্রুতগতিতে ও বহুবার মাথা উপর-নিচ করাকে কম্পিত মস্তকচলন বলে। রাগ-ক্রোধ, বিশেষভাবে বোঝা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি বোঝাতে কম্পিত মস্তকচলন করা হয়ে থাকে।

দ্রুতগতিতে উপর-নিচ দ্রুতগতিতে উপর-নিচ

ধুত
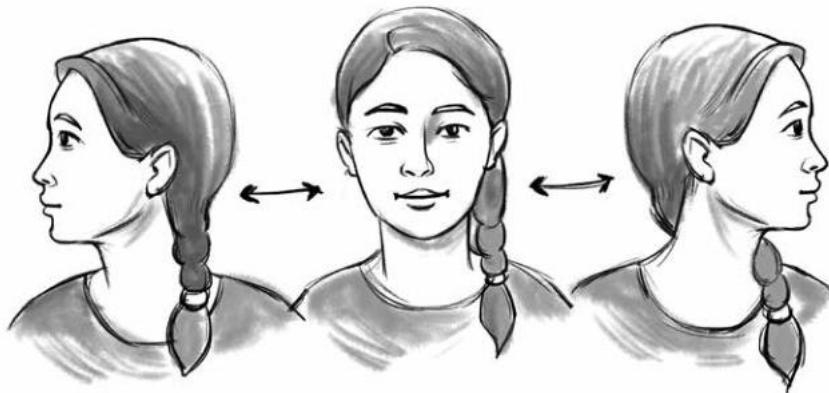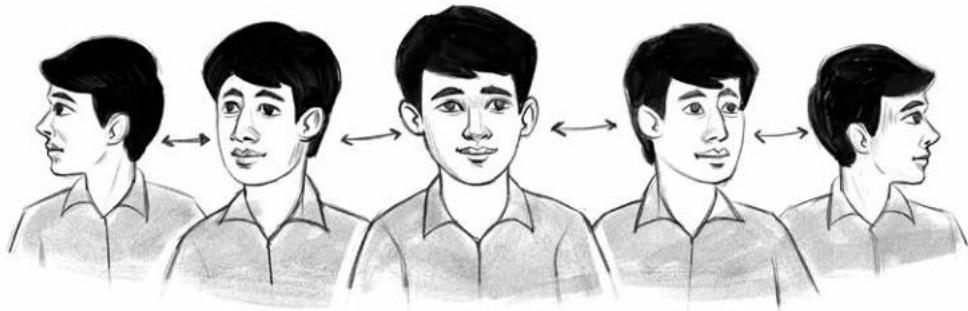
ধীরে ধীরে মস্তক ডানে–বামে সঞ্চালন করাকে ধুত মস্তকচলন বলা হয়। পাশে তাকাতে, বিস্ময়-বিষাদ-স্থির বিশ্বাস প্রকাশে ধুত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে মস্তক ডানে–বামে এবং বামে–ডানে সঞ্চালন

বিধুত

ধুতের মতো মস্তক দ্রুত সঞ্চালনকে বিধুত বলা হয়ে থাকে। শীত অনুভূত হওয়া, ভয় পাওয়া, রোগে ভোগা ইত্যাদি বোঝাতে বিধুত মস্তকচলন করা হয়ে থাকে।

দ্রুতগতিতে মস্তক ডানে–বামে এবং বামে–ডানে সঞ্চালন

এই পাঠে যেভাবে আমরা কাজের অভিজ্ঞতা পাব:

ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির গৌরব গাঁথাকে তুলে ধরা। পাশাপাশি এসব সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আংশগ্রহণকারী সকল বীর এবং বিদেশি বন্ধুকে সম্মান জানাতে আমরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। আমাদের এই আয়োজনের নাম হবে ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’। আমরা শ্রেণির সকল সহপাঠী সমান সংখ্যকভাবে মোট সাতটি দল গঠন করব। ১৯৫২-সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের প্রাণের স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। দলগুলো যথাক্রমে এই নামে চিহ্নিত হবে। প্রতিটি দল অনুষ্ঠানের দিন নিজেদের প্রদর্শনী ও পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন থেকে

মহান মুক্তিযুদ্ধের যেকোনো ঘটনাকে তুলে ধরতে পারব। উপর্যুক্ত ধাপগুলো অনুসারে দলের নামকরণ হলেও যেকোনো দল ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের যেকোনো ঘটনাকে নিয়ে নিজেদের মতো করে প্রদর্শনী ও পরিবেশনার থিম সাজাতে পারবে। এবার নিম্নোক্তভাবে আমরা নিজেদের দলের প্রদর্শনী ও পরিবেশনার পরিকল্পনা করব।

দলের পরিবেশনা ও প্রদর্শনীর জন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেভাবে আমরা কাজটা করব:
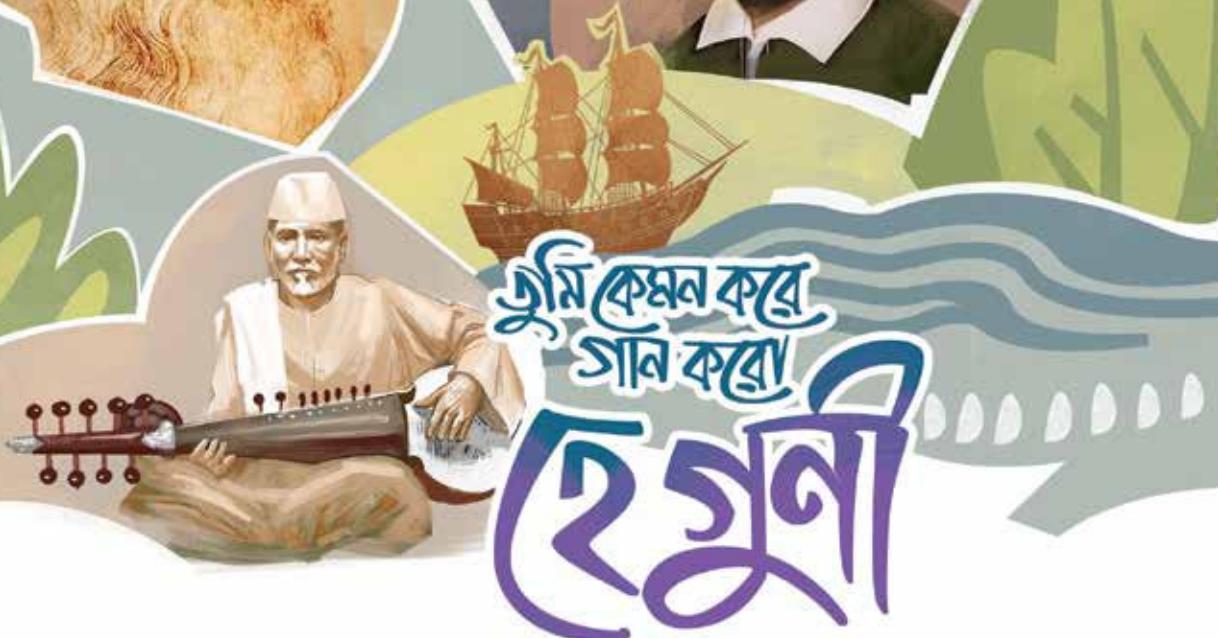
- প্রথমে আমরা শ্রেণির সকল সহপাঠী সমান সংখ্যায় ভাগ হয়ে সাতটি দল গঠন করব।
- দলগুলোর নাম রাখব যথাক্রমে ১৯৫২-সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬-সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২-সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-সালের এর গণ-অভ্যুত্থান , ১৯৭১-সালের এর মুক্তিযুদ্ধ।
- প্রথমে প্রতিটি দল নিজ দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে দলের প্রদর্শনী ও পরিবেশনার পরিকল্পনা ঠিক করে নেব। সে অনুযায়ী দলের মধ্যে দুটি অংশ থাকবে। একটি অংশ প্রদর্শনী ও পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করবে, অন্য অংশটি দলীয় প্রদর্শনী ও পরিবেশনার সব আয়োজন করব।
- এরপর প্রতিটি দল নিজেদের পরিকল্পনাসহ প্রদর্শনী ও পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী এবং নিজ দলের সংগঠকদের নামের তালিকা শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষকের কাছে জমা দেব।
- দলের প্রত্যেক সদস্য নিজের প্রদর্শনী ও পরিবেশনার শিল্পকর্ম রচনা করার পূর্বে তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করব। এসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য উক্ত সদস্য বিভিন্ন উৎস যেমন: বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সংবাদ, প্রামাণ্য চিত্র, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির সহায়তা নেয়া যায। সংগৃহীত তথ্য -উপাত্ত দিয়ে উক্ত সদস্য নিজের শিল্পকর্মের বিষয় ঠিক করে দলের বাকি সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করব। এতে দলের অন্য বাকি সদস্যরা প্রদর্শনী ও পরিবেশনার সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারবে।
- দলের যেসব সদস্য ছবি আঁকা বা গড়ার কাজ করব, তারা ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যেকোনো বিষয়কে এঁকে, ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে তুলে ধরতে পারব। যারা কোনো কিছু গড়তে চাই তারা, নিজেদের চারপাশের সহজলভ্য উপকরণ যেমন: কাগজ, কাঠ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে শহিদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, জাতীয় ফুল শাপলা ইত্যাদি দিয়ে গড়া শিল্পকর্ম উপস্থাপন করতে পারব।
- দলের যেসব সদস্য গানে অংশগ্রহণ করব, তারা প্রথমে ভাষা আন্দোলনের গান অথবা দেশাত্মবোধক গানের তালিকা তৈরি করে নিব। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত গান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশিত গানের তালিকা থেকে নিজের পছন্দমতো তালিকা তৈরি করে নেব। এক্ষেত্রে মূল গানের গীতিকার, সুরকার, শিল্পী সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করে নেব। এবার এসব গানের মধ্য থেকে নিজের পছন্দের গান দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিবেশনার ব্যবস্থা করব। পরিবেশনার আগে গান বিষয়ে সব তথ্য উপস্থাপন করব।
- দলের সদস্যদের মধ্য থেকে যারা নাচে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত গানের সঙ্গে নাচের পরিকল্পনা করব। সে নাচের পরিকল্পনা একক অথবা দ্বৈত অথবা দলগত হতে পারে। দলের মধ্যে নাচ ও গানের দলের সমন্বিত পরিবেশনার ব্যবস্থা হতে পারে।

- দলের কোনো সদস্য চাইলে ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যেকোনো বিষয়কে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারে। তাছাড়া দলের সদস্যরা চাইলে নিজেদের মতো করে রচনা করে দলীয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যেকোনো বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে পারে।
- সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে নেব কোন সদস্য কী পরিবেশনা বা প্রদর্শন করব।
- দলের বাকি সদস্যরা দলের পরিবেশনায় আয়োজক/ সংগঠকের ভূমিকা পালন করব। আয়োজকরা দলের বিষয় অনুসারে মঞ্চসজ্জা, শ্রেণিকক্ষ সজ্জা, দলের পরিবেশনার পোস্টার তৈরিসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকব।
- দলের প্রদর্শনী বা পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা নিজেদের তৈরি দলীয় বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ইচ্ছেমতো মাধ্যমে ছবি এঁকে, নকশা করে, ক্যালিগ্রাফি করে, কোনোকিছু গড়া বা বুনে গান গেয়ে, নাচ করে, অভিনয় বা আবৃত্তির সৃজনশীল উপস্থাপনা এবং প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে নিজেদের দলের বিষয়টি উপস্থাপন করব।
- প্রতিটি দল নিজেদের প্রদর্শনী ও পরিবেশনার সময় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বিদেশি বন্ধুদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক বন্ধুর অবদানকে তুলে ধরব। নির্ধারিত বিদেশি বন্ধুর অবদান লিখিতভাবে অথবা উপস্থাপনার মাধ্যমে করব।
- প্রতিটি দলের পরিবেশনার পরে নির্দিষ্ট দলের উপস্থাপনা ও প্রদর্শনীর বিষয়ে বাকি দলের সদস্যরা তাদের গঠনমূলক মতামত জানাব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব:

- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা মতো প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে চিত্রের নিয়মনীতি বৈচিত্র্য অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে নাচের এবং আঙ্গিকগত অভিনয়ের মস্তক সঞ্চালন অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা মতো 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' অনুষ্ঠানটি শ্রেণিকক্ষে আয়োজন করব।
- মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা দেশি-বিদেশি শিল্পীদের শিল্পকর্ম ও সৃষ্টিশীল জগৎ সম্পর্কে আরো জানব।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন--
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এমন কিছু মানুষের আগমন হয়েছে, যাঁরা নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে নিজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। এবার আমরা জানব বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাসের তেমন কিছু আলোকিত মানুষের কথা। যাঁদের দেখানো আলোর পথ ধরে আজও সারা পৃথিবীর শিল্পীরা নিজেদের নতুন সৃষ্টিশীলতার ভুবন রচনা করেন। এই পাঠে আমরা এমন কিছু সৃজনশীল মানুষ এবং তাঁদের মহান সৃষ্টি সম্পর্কে জানব।

ইতালীয় রেনেসাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৪৫২ সালের ১৫ এপ্রিল ইতালির ফ্লোরেন্সের অদূরে তুসকান এলাকার ভিঞ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম লিওনার্দো দি সের পিয়েরো দা ভিঞ্চি (Leonardo di piero da vinchi) । বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভিঞ্চি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর,

স্থপতি, সমরযন্ত্র উদ্ভাবক, সংগীতজ্ঞ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। ইতালীয় রেনেসাঁসের সময় প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শরীরের অঙ্গসংস্থান ও রক্তসঞ্চালনসহ বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা ছিলনা যেখানে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেননি। যার ফলে তাঁকে বলা হয় দ্য ইউনিভার্সেল ম্যান (The Universel man)।

ভিঞ্চি ১৪৬৯ সালে ইতালির নামকরা চিত্রকর ও ভাস্কর আন্দ্রেয়া ভেরোচ্চিওর স্টুডিওতে শিক্ষানবিশ হিসেবে শিল্পচর্চা শুরু করেন। ১৪৭৬ সাল পর্যন্ত চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। শিক্ষানবিশ থাকা অবস্থাকালেই ১৪৭২ সালে চিত্রশিল্পীদের সংগঠনে যোগ দিয়ে চিত্রকর হিসেবে তিনি জীবনের শুভ সূচনা করেন।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ টান। তিনি নানা প্রকার পতঙ্গ ও পাখির ওড়াউড়ি লক্ষ্য করতেন। পাখির ডানা নাড়িয়ে ওড়া দেখতে পাখির পিছনে ছুটতেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি ওড়ার যন্ত্রযান–হেলিকপ্টারের নকশা আঁকেন। আজকের উড়োজাহাজের প্রাথমিক ধারণা ৫০০ বছর আগে তিনিই দিয়েছিলেন। মানব রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তিনি অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতিসহ দেহের নানান বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতেন এবং সেসবের নিখুঁত ছবি আঁকতেন। বিংশ শতাব্দীর অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার তাঁর ধারণাপ্রসূত নকশা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। তিনি উভয় হাতে একসঙ্গে লিখতে পারতেন। তাঁর দেওয়া শিক্ষামূলক অনেক উক্তি অমর বাণী হয়ে আছে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ইতালীয় রেনেসাঁ পর্বের প্রখ্যাত চিত্রকর। তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা ১০ টির বেশি হবে না; অথচ আশ্চর্যের বিষয়–তাঁর এই সীমিত সংখ্যক শিল্পকর্মের প্রতিটি কাজই সর্বশ্রেষ্ঠ। লিওনার্দোর বিখ্যাত শিল্পকর্মের উল্লেখযোগ্য।

১. মোনালিসা

২. দ্য লাস্ট সাপার

৩. লরেঞ্জ দ্যা মেডিসি

৪. ভার্জিন অব দ্যা রকস

৫. লেডি উইথ অ্যান আরমিন

৬. সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্ট ইত্যাদি।

এসব বিখ্যাত চিত্রকর্মসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নকশা, মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্কেচ, স্থাপত্য-নকশা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অমর হয়ে আছেন।

মোনালিসা:

মোনালিসা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম। মোনালিসার নাম শোনেনি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও রহস্যময় এ শিল্পকর্মটিতে আছে একজন নারীর প্রতিকৃতি বা মুখাবয়ব। ভিঞ্চি ১৫০৩ সালে ইতালির মিলানে অবস্থানকালে এই চিত্রটি আঁকা শুরু করেন এবং ১৫০৬ সালে চিত্রকর্মটি আঁকা সমাপ্ত করেন। কে এই মোনালিসা? তাঁর তির্যক চাহনি ও রহস্যময় চাপা হাসির কারণ জানতে এখনো গবেষণার অন্ত নেই। অনেক গবেষক মনে করেন প্রতিকৃতির নারী ইতালির এক ধনাঢ্য সিল্ক ব্যবসায়ীর স্ত্রী 'লিসা গেরাদিনি'র। মোনা অর্থ ম্যাডাম বা ভদ্রমহিলা (My Lady) এবং লিসা সেই ভদ্রমহিলার নাম।

এই বিখ্যাত চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একজন নারীর মৃদু হাস্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব, পিছনে কাল্পনিক দৃশ্যপট। পপলার কাঠের প্যানেলে তেলরঙে আঁকা ছবিতে ভিঞ্চি নানা রকম টেকনিক ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো স্ফুমাটো (Sfumato) পদ্ধতি। কোনো রকম লাইন ড্রয়িং ছাড়াই আলো-ছায়ার বিভ্রম তৈরির মাধ্যমে ছবি আঁকার পদ্ধতি এটি। এছাড়াও বিশেষ জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এমনভাবে এঁকেছেন যে, চোখের দিকে দৃষ্টি ফেললে মনে হয়, ঠোঁটে আনন্দের হাসি, আবার হাসির দিকে দৃষ্টি রাখলে হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় অর্থাৎ একধরনের দৃষ্টিভ্রমের সৃষ্টি হয়। মোনালিসাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা চিত্রকর্মটি প্যারিসের বিখ্যাত ল্যুভ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

দ্য লাস্ট সাপার

দ্য লাস্ট সাপার বা 'শেষ নৈশভোজ' লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মের একটি। ১৪৯৫ থেকে ১৪৯৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি এই চিত্রকর্মটি সৃষ্টি করেছেন। এটি একটি ম্যুরাল পেইন্টিং অর্থাৎ দেয়াল চিত্র। ইতালির মিলানে অবস্থিত সান্তা মারিয়া দেলে গির্জার (Santa Maria Delle Grazie) ডাইনিং হলের পিছনের দেয়ালে এটি আঁকা। ইতালিতে সে সময় ফ্রেসকো (Fresco) পদ্ধতিতে দেয়ালচিত্র আঁকা বহুল প্রচলিত ছিল। ফ্রেসকো হলো দেয়ালে চুনের পলেস্তারা ভেজা বা কাঁচা থাকা অবস্থাতেই পিগমেন্ট রং, তেল ও কেমিক্যাল ব্যবহার করে আঁকা দেয়ালচিত্র। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই পদ্ধতির বাইরে এসে শুকনা পলেস্তারার উপর গুড়ো রং, পানিতে দ্রবণীয় পিগমেন্ট ও গাম ব্যবহার করে দ্য লাস্ট সাপার চিত্রটি আঁকেন। এই পদ্ধতিকে টেম্পারা (Tempera) পদ্ধতি বলে। এটি ফ্রেসকোরই একটি বিশেষ ধরন। পরবর্তী সময়ে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি টেম্পারা পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন করেন। ২৯ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থের এই বিশাল চিত্রকর্ম লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত।
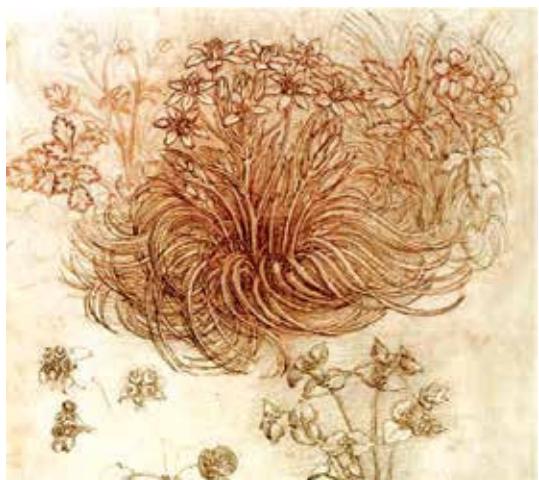
দ্য লাস্ট সাপার ছবির বিষয়বস্তু যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যুর পূর্ব রাতে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে রাতের শেষ খাবারের দৃশ্য। যিশুখ্রিষ্ট ১২ জন শিষ্য নিয়ে নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন। ভোজের কোনো এক সময় ১২ জন শিষ্যের উদ্দেশে ঘোষণা দেন– এই ১২ জনের মধ্য থেকে যে কেউ একজন পরের দিন যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এই মহা আশ্চর্য কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের মাঝে কারো কারো প্রতিক্রিয়া–কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

কেউ ভাবছেন–অবিশ্বাস্য, কেউ একজন ভাবছেন–যিশু জানলেন কীভাবে! এসব অভিব্যক্তি দ্য লাস্ট সাপার চিত্রকর্মে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মহান এই চিত্রশিল্পী। আঁকার শত শত বছর পরও পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ এই চিত্রকর্ম দেখতে ভিড় জমান ইতালির মিলান শহরে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা ফুল, পাতার স্কেচ

ভিঞ্চি তাঁর স্কেচ খাতায় মানব শরীরের অঙ্গসংস্থান, রক্তসঞ্চালন, বিভিন্ন সমরাস্ত্রের নকশা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকৃতির অনেক উপাদান নিখুঁতভাবে স্কেচ করে রেখেছিলেন। এসব স্কেচের সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখতেন। ভিঞ্চির আঁকা এসব ফুল, লতাপাতার স্কেচ দেখলে বুঝা যায়, তিনি কী নিখুঁত দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতির এসব উপকরণকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিচের ছবিগুলো দেখলে আমরা তার কিছুটা অনুমান করতে পারি।

এই পাঠে আমরা যা অনুশীলন করব:

আমরা আমাদের পছন্দের কোনো গাছের পাতা অথবা ফুল সংগ্রহ করব এবং তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ স্কেচ করার অনুশীলন করব। অনুশীলনের সময় আমরা খেয়াল রাখব, আমাদের স্কেচটা যেন মূল পাতা অথবা ফুলের মাপের সমান হয়। কোনোভাবে যেন বেশি ছোটো বা বড়ো না হয়ে যায়।

- প্রথমে আমরা পছন্দমতো একটি পাতা অথবা ফুলের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করার জন্য সংগ্রহ করব।
- এরপর সংগ্রহ করা ফুল এবং পাতাটি সামনে রেখে সেটিকে গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করব। যেমন: পাতা বা ফুলটি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে কত বড়ো। সেটির গভীরতা কতটুকু, সেটির রং কেমন, সেটির কোনোখানে ছেড়া বা ছিদ্র আছে কি না, সেটির ধরন কেমন সোজা নাকি আঁকাবাঁকা, সেটির শিরা-উপশিরা এবং বৃন্তের গঠন কেমন ইত্যাদি। ফুলের ক্ষেত্রে সেটির পাপড়ির সংখ্যা কত, পাপড়ির গঠন কেমন, পরাগদণ্ড এবং পরাগদানির গঠন কেমন, পাপড়িগুলো বৃত্যাংশের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করব।
- এবার আমরা যে স্থানে বসে আছি, সেখান থেকে পাতা অথবা ফুলটা দেখতে কেমন লাগছে তা অনুধাবন করে তার একটি হালকা আউটলাইন ড্রয়িং করার চেষ্টা করব। এরপর আমরা ধীরে ধীরে তার ডিটেইলগুলো আঁকার চেষ্টা করব।
- আঁকার সময় পাতা বা ফুলটির কোন অংশে বেশি আলো আর কোন অংশে অন্ধকার তা ভালোভাবে দেখে পেনসিল টোন দিয়ে আলো-ছায়া ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- এভাবে অনুশীলনের পর আমরা চাইলে তা রংপেনসিল, জলরং ইত্যাদি মাধ্যমে অনুশীলন করতে পারি। এরকম অনুশীলনের চিত্রকে বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করে আমরা নতুন আঙ্গিকের চিত্র রচনা করতে পারি। ছবি আঁকার ভাষায় যাকে বলা হয় চিত্র রচনা (Composition)।
- এছাড়া এই পাতা বা ফুলের পছন্দমতো অংশ নিয়ে তা বারবার একই রকমভাবে ব্যবহার করে আমরা নকশা তৈরি করতে পারি।

পাতার হালকা আউটলাইন ড্রয়িং　　পাতার ডিটেল ড্রয়িং　　সম্পূর্ণ পাতার স্কেচ

ফুলের হালকা আউটলাইন ড্রয়িং　　ফুলের ডিটেল ড্রয়িং　　সম্পূর্ণ ফুলের স্কেচ
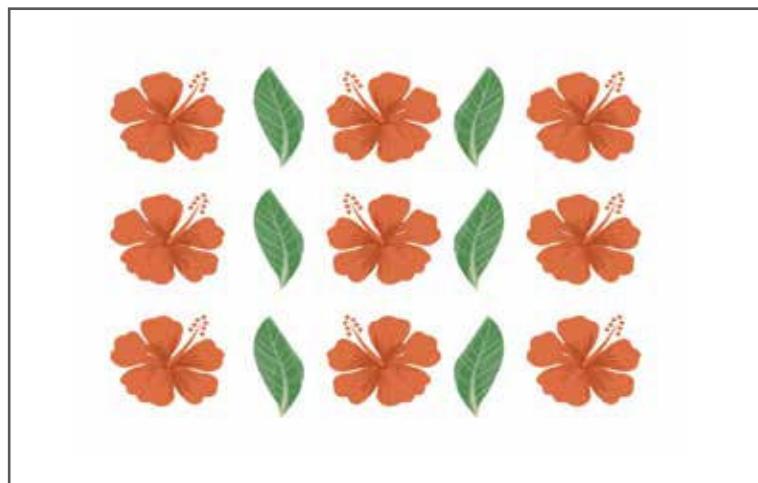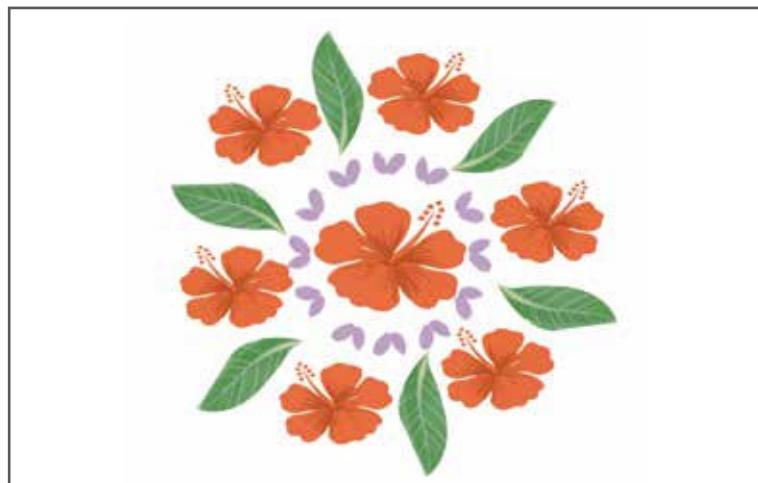
ফুল, পাতা দিয়ে চিত্র রচনা

ফুল, পাতা দিয়ে নকশা

আমরা কি জানি বিশ্ব–শিল্পকলা দিবস কোন তারিখে পালন করা হয়? ১৫ এপ্রিল হলো বিশ্ব শিল্পকলা দিবস। বিশ্বব্যাপী শিল্পীদের সৃজনশীল কর্মের বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এই দিবস পালন করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্ট (IAA) প্রথমে এই ঘোষণা করে, পরে ইউনেস্কো দ্বারা তা স্বীকৃত হয়।

বিশ্বশান্তি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব এবং বহুসংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। এই মহান শিল্পীর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান জানাতে এই শিল্পীর জন্মদিন ১৫ এপ্রিল সারা পৃথিবীতে 'বিশ্ব শিল্পকলা দিবস' পালন করা হয়।

এবার আমরা একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক এবং নাট্যকার সম্পর্কে জানব। তিনি হলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইংরেজি সাহিত্য, কবিতা ও নাটকের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। তিনি ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি ও অ্যাভনের চারণ কবি (Bard of Avon) নামে পরিচিত। তিনি ইংল্যান্ডের স্ট্র্যাটফোর্ড আপঅন অ্যাভনে ১৫৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের একজন অগ্রণী নাট্যকার হিসেবে তাঁর কাজগুলো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এক অনন্য ভূমিকা রেখেছে।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছিলেন জন শেক্সপিয়র এবং মেরি আরডেনের তৃতীয় সন্তান। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, তবে এটি বিশ্বাস করা হয় যে তিনি স্থানীয় ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন এবং সেখানে তিনি ল্যাটিন ব্যাকরণ ও ধ্রুপদি সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি অ্যান হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর তিনটি সন্তান ছিল। জীবনের কুড়ির দশকের প্রথম দিকে, শেক্সপিয়র লন্ডনে চলে যান। ১৫৮৫ থেকে ১৫৯২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ রানি এলিজাবেথের শাসনামলে তিনি নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সেই সময়ের একটি নেতৃস্থানীয় নাটকের দল 'লর্ড চেম্বারলেইনস ম্যান'-এর সঙ্গে একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। যে কোম্পানি পরবর্তীকালে কিংস ম্যান নামে পরিচিতি পায়। গ্লোব থিয়েটার নামে খ্যাত সেই মঞ্চে তাঁর নাটকের আধিপত্য, সাংস্কৃতিক বিনোদনের বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে যা গড়ে ওঠে।

শেক্সপিয়ারের সাহিত্যিক অবদানগুলো বিশাল, যার মধ্যে রয়েছে ৩৭টি নাটক, ১৫৪টি সনেট এবং দুটি দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা। তার নাটকগুলো তিনটি বিভাগে বিভক্ত: ট্র্যাজেডি (বিয়োগান্ত), কমেডি এবং ঐতিহাসিক নাটক। তার কিছু বিখ্যাত কাজের মধ্যে রয়েছে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট,' 'হ্যামলেট,' 'ম্যাকবেথ,' 'ওথেলো,' 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম,' এবং 'জুলিয়াস সিজার' ইত্যাদি। তাঁর এই বিখ্যাত নাটকগুলো অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৫৮৯ থেকে ১৬১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৬২৩ সালে শেক্সপিয়রের ৩৬টি নাটক নিয়ে তাঁর সহকর্মীরা প্রথম ফলিও তৈরি করেছেন, যেখানে নাটকগুলোর প্রথমবারের মতো শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি যৌথভাবে অন্য নাট্যকারদের সাঙ্গে কয়েকটি নাটকও রচনা করেছেন।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো গঠনের দিক থেকে সাধারণত ৫ অ্যাক্ট বা অভিনয়ের কাঠামো অনুসরণ করে, যা ড্রামাটিক প্যাটার্ন বলে অভিহিত করা হয়।

চার শতাব্দীর বেশি সময় ধরে শেক্সপিয়ারের কাজগুলো বিশ্বব্যাপী চর্চিত হয়ে এসেছে। তাঁর নাটকগুলো অগণিত ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং তাঁর চরিত্র ও গল্পগুলো চলচ্চিত্র থেকে উপন্যাস শিল্পের সকল মাধ্যমকে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসেও শেক্সপিয়রের নাটক আজও চর্চিত ও সমাদৃত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহান নাট্যকারের জীবনাবসান ঘটে ১৬১৬ সালে।

এই পাঠে আমরা যা অনুশীলন করব:

অঙ্গগত অভিনয় এবং নাচের সময় অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য চোখের ভঙ্গিমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবার আমরা জানব চোখের ভঙ্গিমা সম্পর্কে।

চোখের ভঙ্গিমা:
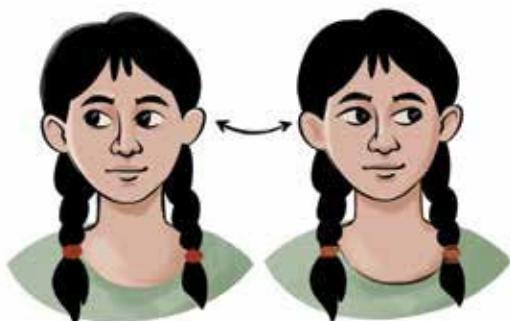
যখন চোখের তারা, অক্ষিপট (চোখের পাতা) এবং ভ্রূ সম্মিলিতভাবে কাজ করে অভিনয় বা নৃত্যের ভাবপ্রকাশ করে, তখন সেটিকে চোখের ভঙ্গিমা বলা হয়ে থাকে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, যেদিকে হাত যায়, সেদিকে দৃষ্টি চলে যায়, যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেদিকে মন ধাবিত হয়, আর মন যেখানে নিযুক্ত হয়, সেখানে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। এতেই অভিনয় বা নৃত্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। চোখের দৃষ্টি ভাবপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। বিভিন্ন ধরনের চোখের ভঙ্গিমা রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চোখের ভঙ্গিমা আলোচনা করা হলো–

সম: যখন চোখের তারা, চোখের পাতা এবং ভ্রু স্বাভাবিক, স্থির ও সমান থাকে, তখন সম চোখের ভঙ্গিমা হয়ে থাকে। শান্ত, সৌম্য বোঝাতে এই চোখের ভঙ্গিমা করা হয়ে থাকে।

সাচী: যখন চোখের তারা কোনাকুনি বা তির্যকভাবে একবার ডানে, পরক্ষণেই বামে তাকানো হয়, তখন সাচী চোখের ভঙ্গিমা হয়ে থাকে। পাশে তাকানো, পাশে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে, কোনো কিছু লুকাতে এই চোখের ভঙ্গিমা করা হয়ে থাকে।
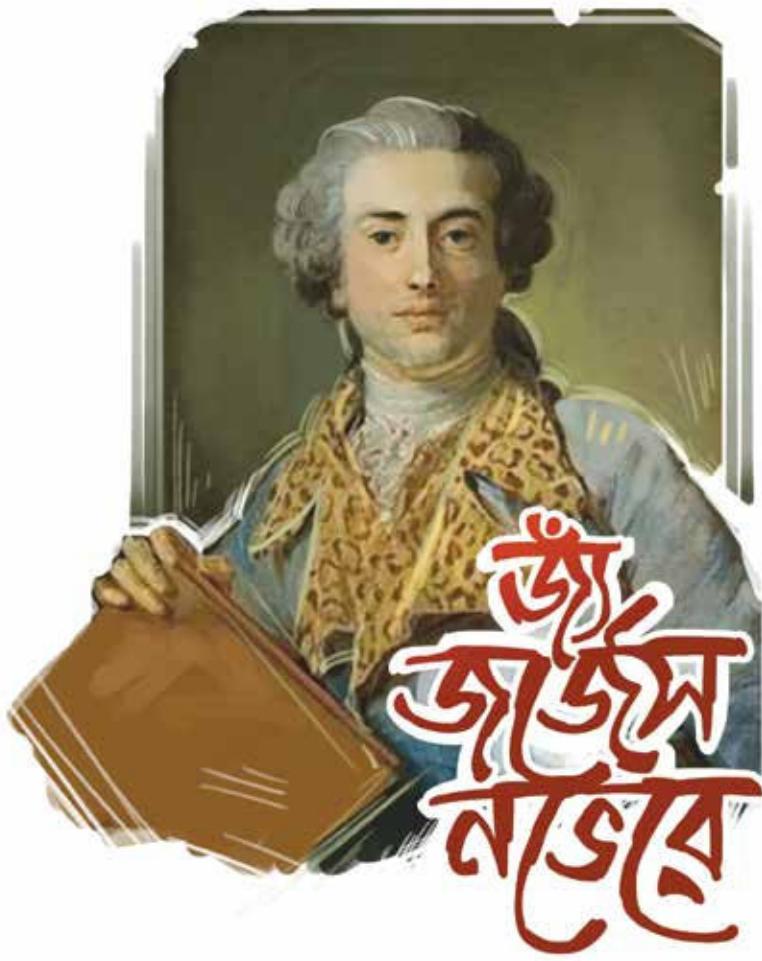
প্রলোকিত: চোখের তারা দিয়ে যখন পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে ডানে-বামে তাকানো হয়, তখন প্রলোকিত চোখের ভঙ্গিমা হয়। লজ্জা, ভয়, দ্বিধা ইত্যাদিতে প্রলোকিত চোখের ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়।

উল্লোকিত: উপরে তাকানোকে উল্লোকিত বলা হয়ে থাকে। উপরে কিছু দেখা, চিন্তা করা ইত্যাদি কর্মে উল্লোকিত চোখের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নৃত্যে শাস্ত্রগত প্রথার প্রচলন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তৎকালীন ইউরোপে শাস্ত্রগত নৃত্যের প্রথা প্রচলিত হয়নি। এই ঘন তমসার মহা অবসান ঘটান ফরাসি ব্যালে নৃত্যপরিচালক জ্যঁ জর্জেস নভেরে। তিনি 'লেট্রেস সুর লা ডান্সে এট সুর লে ব্যালে' লেখার মাধ্যমে ব্যালে নৃত্যের এক যুগান্তকারী বিবর্তন এনে দিয়েছেন। এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ২৯ এপ্রিল ১৭২৭ সালে। ব্যালে নৃত্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে ব্যালে ডি'অ্যাকশন গঠনের মাধ্যমে এই নৃত্যে অবদানের জন্য তাঁর জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ১৬৬১-১৬৮১ সালের মধ্যে ব্যালে নৃত্য ফ্রান্সের রাজদরবারের অঙ্গন থেকে মঞ্চে পরিবেশিত হতে শুরু করে। এসময় ব্যালে নৃত্যের উপাদানগুলোকে 'লা ট্রায়াম্ফ ডে ল'আমোর' নামক ফরাসি অপেরায় ব্যবহার করে। এতে ব্যালে নৃত্যের নিজস্ব ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে থাকে। অপেরা-ব্যালের একটি দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য তৈরি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি ব্যালে মাস্টার জ্যঁ জর্জেস নভেরে অপেরা-ব্যালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে, ব্যালে একটি স্বকীয় শিল্পধারা। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, ব্যালে একটি অভিব্যক্তিপূর্ণ, নাটকীয়তাপূর্ণ শিল্প মাধ্যম, যেখানে নাটকের চরিত্রগুলো প্রকাশিত হবে। তিনি ব্যালে ডি'অ্যাকশন প্রবর্তন করেন যেখানে ব্যালে পরিবেশনার উপাদান–মঞ্চের নঁকশা, পোশাক এবং প্রযোজনা তৈরির পদ্ধতি একত্রীকরণ করেছেন। নভেরের বিখ্যাত প্রযোজনাগুলো হলো–লেস ফেটেস চিনোইসেস (১৭৫৪), মেডি এট জেসন ও সাইচে এট ল'আমোর (১৭৬০-৬৭)। পরবর্তীকালে ১৭৭৬ সালে তিনি প্যারিস অপেরায় ব্যালে মাস্টার হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর এই যুগান্তকারী বিবর্তনের জন্য ১৯৮২ সালে, ইউনেসকো আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই)-এর আন্তর্জাতিক ডান্স কমিটি, জ্যঁ জর্জেস নভেরের জন্মদিবসকে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আজ বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯ অক্টোবর ১৮১০ সালে জ্যঁ জর্জেস নভেরে মৃত্যুবরণ করেন।

এই পাঠে আমরা যা অনুশীলন করব:

অঙ্গাগত অভিনয় এবং নাচের সময় অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঘূর্ণন। এবার আমরা জানব ঘূর্ণন সম্পর্কে।

ঘূর্ণন:

শারীরাভিনয় বা নৃত্যে ঘুরে যাওয়াকে ঘূর্ণন বলা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে অর্থাৎ ভ্রমরের মতন ঘুরে ঘুরে মধু পান করাকে ভ্রমরীও বলে থাকে। অনেক ধরনের ঘূর্ণন আছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

চক্র: ডান পায়ের ওপর ভর রেখে বাম দিকে ঘুরে যাওয়াকে চক্র বলা হয়। চাকার মতো ঘোরা হয় বলে একা চক্র নামে অভিহিত করা হয়।
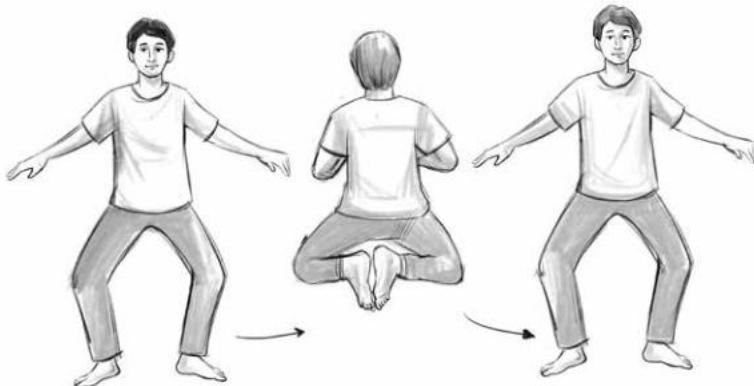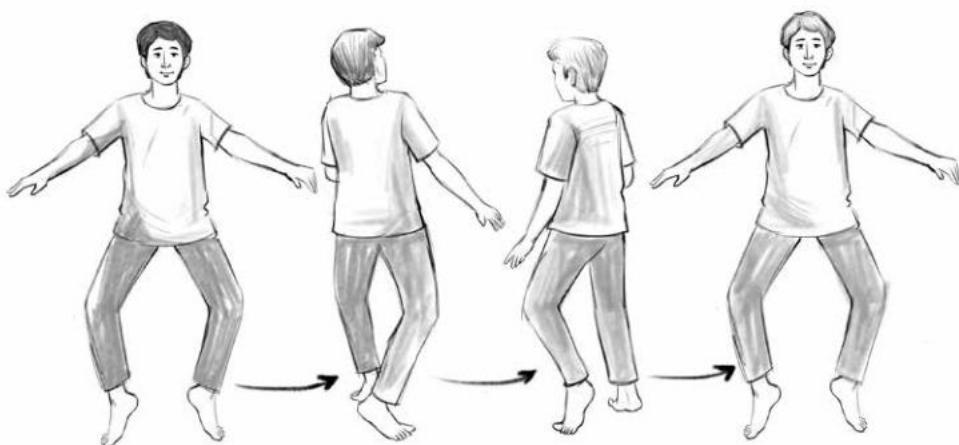
একপদ : এক পা মাটিতে রেখে অন্য পা ভাঁজ করে ঘুরে যাওয়াকে একপদ বলা হয়ে থাকে।
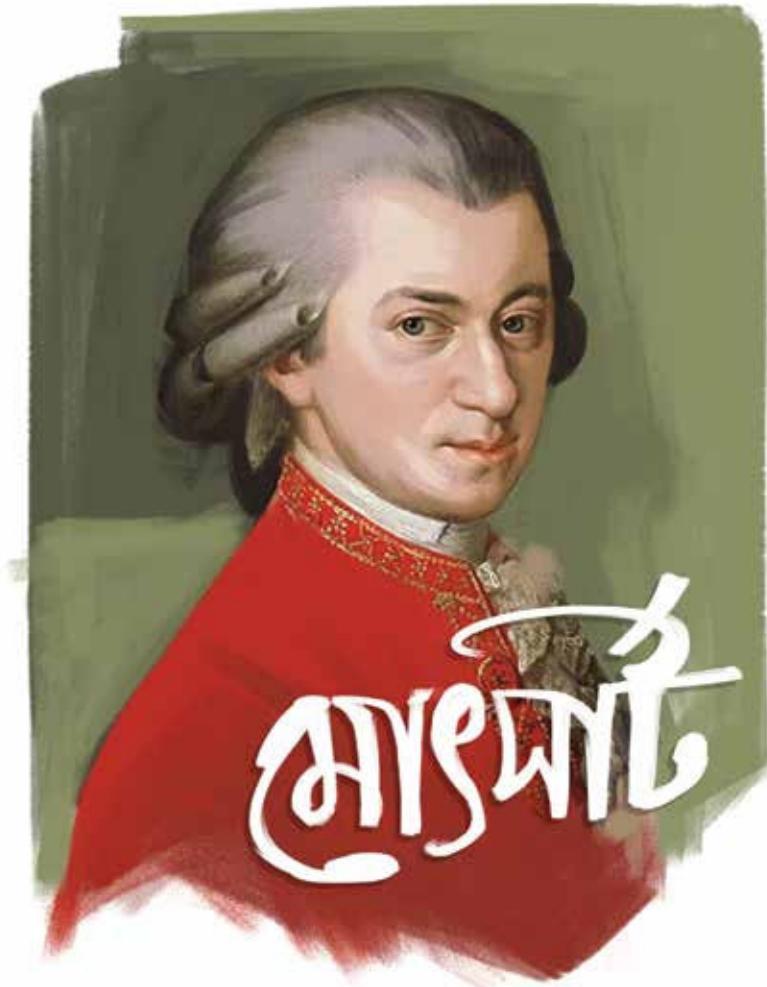
আকাশ: দুই পা ভাঁজ করে লাফ দিয়ে ঘুরে আগের স্থানে ফিরে আসাকে আকাশ বলা হয়।

কুঞ্চিত: অর্ধেক বসা অবস্থায় পায়ের আঙুলের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে ঘুরে আসাকে কুঞ্চিত বলা হয়।

এবার আমরা এমন এক সুরস্রষ্টার কথা জানব যিনি নিজের সৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীর সকল সংগীত প্রেমীকে বিমোহিত করে রেখেছেন। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সংগীত ও সুর সৃষ্টির মাধ্যমে কত সহজে মানুষের ভাবনালোককে আন্দোলিত করা যায়, এ বিষয়টি মোৎসার্টের

সৃষ্ট গান শুনলেই সহজে অনুমান করা যায়। সংগীতে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার কাছেই। মোৎসার্ট ২৭ জানুয়ারি ১৭৫৬ সালে অস্ট্রিয়ার সালজবর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ভোল্‌ফগাংক্ আমাডেয়ুস মোৎসার্ট। তাঁর পিতার নাম লিওপোল্ড এবং মায়ের নাম আন্না মারিয়া মোৎসার্ট। তিনি সেখানকার আর্চ বিশপের সংগীত শিক্ষক ছিলেন।

খুব ছোটোবেলা থেকেই মোৎসার্টের সংগীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। পিতা লিওপোল্ড এজন্য মোৎসার্টকে সংগীত শেখানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই সুর রচনা করে সবাইকে মুগ্ধ করতে সমর্থ হন। সাত বছর বয়সে পিতার সঙ্গে সংগীত সফরে বের হন। এ সময়ে তিনি ভিয়েনার রাজপ্রাসাদে সংগীত পরিবেশন করে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে মুগ্ধ করেন। ছোট্ট মোৎসার্টের সংগীত শুনে রাজকুমারী মেরি এন্টিওনেট বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। শৈশবকালেই তিনি বেহালা, অর্গান ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদনে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৩ বছর বয়সে ইতালিতে যান এবং সেখানে প্রায় দুই বছর বিভিন্ন শহরে সংগীত পরিবেশন

করেন। এরপর তিনি লন্ডন এবং প্যারিস সফর করেন। লন্ডনে অবস্থানকালে মোৎসার্ট ১০টি সনেট রচনা করেন। তাঁর বেহালা ও অর্গানের সুর মূর্ছনায় দুই দেশের মানুষ বিমোহিত হয়। একবার ইতালিতে সিস্টাইন চ্যাপেলের আধ্যাত্মিক সংগীত পরিবেশন করে রোমের পোপকে তিনি মুগ্ধ করেন। ২৬ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর মূল সৃষ্টিগুলো অপেরা, সিম্ফনি, ম্যাস ও প্রার্থনা নামে পরিচিতি পেয়েছে। মোৎসার্টের ৪০টি সিম্ফনির মধ্যে 'জুপিটার সিম্ফনি' সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। 'দি ম্যারেজ অব ফিগারো' এবং 'ডন গিয়েভানি' তাঁর সৃষ্ট সেরা অপেরা, তবে 'ম্যাজিক ফ্লুট'কে বলা হয় শ্রেষ্টতম অপেরা।

সংগীত জীবনের শেষভাগে 'রেকয়ায়েম' বা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে তিনি সংগীত রচনা করেন। ইউরোপজুড়ে তাঁর সৃষ্ট সুর সাধারণ মানুষের মনে আলোড়ন তৈরি করে। সেখানে তিনি সারা জীবনের সংগীত সাধনার সফল প্রয়োগ করতে সমর্থ হন, যেটি সারা পৃথিবীর সংগীত পিপাসুর কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এটিকে তিনি 'নিজের শেষকৃত্যের জন্যই রচিত' সুর বলে মন্তব্য করেন। তাঁর সৃষ্ট সুরের পরশে মানুষের অন্তরলোকের সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যুর ভাবনাকে ছাপিয়ে মনকে নিয়ে যায় আরেক অতীন্দ্রিয় জগতে। ৫ ডিসেম্বর ১৭৯১ সালে এই বিখ্যাত সংগীত স্রষ্টা পরলোক গমন করেন।

এই পাঠে আমরা যা অনুশীলন করব:

প্রথমে আমরা জানব শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে। এরপর আমরা একটা তাল সম্পর্কে জানব এবং হাতে তালি দিয়ে তালের মাত্রাগুলো বুঝব এবং অনুশীলন করব।

শাস্ত্রের নিয়ম মেনে যে সংগীত পরিবেশন করা হয় সেটিকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলা হয়। সংগীতের নির্দিষ্ট

রীতিনীতি মেনে রাগ-রাগিণীর রূপ, কণ্ঠ তথা বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। সংগীতের এই নিয়ম,-কানুন, বিধি-নিষেধ যেখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, তাকে সংগীত শাস্ত্র বলা হয়। এই শাস্ত্রীয় তথা উচ্চাংগ সংগীত বা শুদ্ধ সংগীত নামে পরিচিত। শাস্ত্রীয় সংগীত দুইভাবে পরিবেশিত হয়–কণ্ঠের মাধ্যমে এবং

যন্ত্রের মাধ্যমে। শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস অনেক পুরোনো। বৈদিক যুগ থেকে এই সংগীতের চর্চার ইতিহাস পাওয়া যায়।

১। উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীত,

২। দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সংগীত

এবার আমরা একটি তালের সঙ্গে পরিচিত হব। এই তালটার নাম তেওড়া তাল। এটি ৭ মাত্রার একটা বিষমপদী ছন্দের তাল। এতে তিনটি তালি থাকে, কোন খালি নেই।

+				২			৩		
১	২	৩	।	৪	৫	।	৬	৭	।
ধি	ধি	না	।	ধি	না	।	ধি	না	।

এবার আমরা জানব, এমন এক সুর স্রষ্টার কথা যাঁর জন্ম আমাদের এই বাংলাদেশে। যিনি উপমহাদেশীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করেন। উপমহাদেশীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'সুর সম্রাট' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি হলেন মহান সুর স্রষ্টা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ।

বড় ভাই ফকির আফতাব উদ্দিন খাঁ ছিলেন তাঁর প্রথম সংগীত শিক্ষক। পিতার নাম সবদর হাসেন খাঁ, সবাই তাকে ‘সদু খাঁ’ নামেই চিনতেন। মাতার নাম সুন্দরী খানম। সদু খাঁর পাঁচ পুত্রের প্রায় সবাই সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন সে সময়ের বেশ জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত সংগীত পরিবারে ৮ই অক্টোবর ১৮৬২ সালে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আলম। পারিবারিক কারণে তিনি বাল্যকালেই সংগীতের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সংগীতের প্রতি ভালোবাসার কারণে পরিবারের সবার অগোচরে তিনি পাশের গ্রামের এক যাত্রাদলে যোগ দেন। সে দলের সঙ্গে তিনি ঢাকা হয়ে কলকাতায় যান। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার গায়ক নুলো গোপালের কাছে কণ্ঠসংগীতে তালিম নেওয়া শুরু করেন। সেখানে কঠোর সংগীত সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রায় অর্ধযুগ কেটে যায়। কিন্তু গুরুর মৃত্যুর ফলে তাঁর সে সাধনা বাধাগ্রস্ত হয়। একসময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি আর কণ্ঠসংগীত চর্চা করবেন না, চর্চা করবেন যন্ত্রসংগীতের। এবার তিনি কলকাতার বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা বাদক অমৃতলাল দত্তের অর্কেস্ট্রা দলে যোগ দেন। বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশ ঘোষ তাঁর নাটকে এই অর্কেস্ট্রা দলকে ব্যবহার করতেন। এখানে দিনের বেলা তিনি তালিম নিতেন আর রাতের বেলা অর্কেস্ট্রা দলে বাজাতেন। বিখ্যাত মিনার্ভা থিয়েটারেও তিনি কিছুকাল কাজ করেছেন। এ সময়ে গোয়ানিজ ব্যান্ডমাস্টার মিস্টার লবোর কাছে পাশ্চাত্যরীতিতে এবং অমর দাশের কাছে হিন্দুস্থানি নিয়মে বেহালা বাজানো রপ্ত করেন। এছাড়া তিনি নন্দবাবুর কাছে পাখওয়াজ এবং হাজারী ওস্তাদের কাছে সানাই শেখেন, আর অমৃতলালের কাছে শেখেন ক্লারিওনেট। সংগীতবিদ্যায় তখন তিনি প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এরপর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জগৎ কিশোরের দরবারে তিনি সংগীত পরিবেশন করতে গেলে সেখানে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত সরোদ বাদক ওস্তাদ আহমদ আলী খাঁর

সাক্ষাৎ হয়। আহমদ আলীর বাজনা শুনে তাঁর কাছে তিনি সরোদ বিষয়ে তালিম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে চার বছর শিক্ষা নেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তানসেন বংশীয় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ রামপুরের ওয়াজির খাঁর কাছে দীর্ঘকাল সংগীত বিষয়ে তালিম গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ওয়াজির খাঁর কাছে শিখেই স্বাধীনভাবে সংগীত চর্চা শুরু করতে কলকাতায় চলে আসেন।

রাগ সংগীতের বিষয়ে ব্যাপক পান্ডিত্য, যন্ত্রসংগীতের পারদর্শিতা, সুর তৈরিতে বিস্ময়কর ক্ষমতা, অসাধারণ সব বাদ্যযন্ত্রের সুর নির্মাণ তাঁকে আমাদের সংগীতে কিংবদন্তির মর্যাদা দান করেছে। ১৯১৮ সালে মাইহারের রাজা তার কাছে সংগীত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাকে মাইহারে গুরুর মর্যাদায় নিয়ে যান। ১৯৩৪-৩৫ সালের দিকে তিনি উদয় শঙ্করের নৃত্য দলের সঙ্গে সংগীত পরিবেশনার জন্য বিশ্বভ্রমণে বের হন। সারা বিশ্বে তিনি এদেশের সংগীত, সুর ও বাদ্যযন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সংগীতে অবদানের জন্য সারা বিশ্ব থেকে তিনি অসংখ্য পুরস্কার এবং উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট রাগ, সুর ও বিশেষ বাদ্যশৈলী শিষ্যদেরকেও শিখিয়েছেন সমানভাবে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, কন্যা অন্নপূর্ণা, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, তিমিরবরণ, পান্নালাল ঘোষ, শ্যামগালী, নিহারবিন্দু চৌধুরী, দ্যুতিকিশোর আচার্য চৌধুরী, ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, নিখিল ব্যানার্জি, শরণ রাণী মাধুর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁরা উপমহাদেশের সংগীত ও সুরকে আজ বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

তিনি অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিবপুর গ্রামে তাঁর নির্মিত মসজিদটি। যা এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করে চলছে। সেখানে তিনি পানি পানের জন্য একটি পুকুর খনন করে দিয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো মাইহার রাজ্যে 'মাইহার কলেজ অব মিউজিক' প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ছিলেন কলেজের সর্বেসর্বা পরিচালক। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর মাইহারে তাঁর নিজ বাড়িতে উপমহাদেশের এই বিখ্যাত সংগীত স্রষ্টার জীবনাবসান ঘটে।

এই পাঠে আমরা যা অনুশীলন করব:

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি, কোমল স্বরগুলো লেখারও নিয়ম হচ্ছে র কে লেখা হয় ঋ, গ কে লেখা হয় জ্ঞ, ধ কে লেখা হয় দ, ন কে লেখা হয় ণ এর মতো করে। এছাড়া কড়ি স্বরে ম স্বরকে লেখা হয় হ্ম এর মতো করে।

এবার আমরা 'ম' এর কড়ি স্বর যাকে সংগীতের ভাষায় লেখা হয় 'হ্ম' তার সারগাম চর্চা করব।

৩। হ্ম-স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চা

আরোহণ-স র গ হ্ম প ধ ন র্স

অবরোহণ-র্স ন ধ প হ্ম জ্ঞ র স

'বিশ্ব সভায় আবার মোরা নতুন করে আসন লবো
আবার মোরা এই জীবনে পুণ্যজ্ঞানে ধন্য হব।'

সময়টা ১৯১৩ সাল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্বদরবারে নিজের স্থান করে নেয়। এর ছয় দশক পর বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন। সময়টা ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। সে ছিল বাঙালি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর মহান আত্মত্যাগের অমরগাথার প্রতি শ্রদ্ধ নিবেদনের মহান প্রয়াশ। এই মহান মানুষদের দেখানো পথ ধরে আমাদের নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে পরিপূর্ণ রূপে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে নিজেদের জানতে হবে। নিজেদের সংস্কৃতি বিশ্বের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্ব সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো আমাদের জানতে হবে এবং প্রয়োজনে তা গ্রহণ করতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই গ্রহণ যেন আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের মূলধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আমাদের শিকড় হবে নিজ সংস্কৃতিতে, তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়। এভাবে নিজের সংস্কৃতিকে অন্তরে ধারণ করে আমরা হয়ে উঠব বিশ্বনাগরিক।

এবার আমরা একটা কাজের পরিকল্পনা করব, আমাদের এই কাজের নাম হবে 'আমরা করব জয়'।

এ পাঠে আমরা যেভাবে অভিজ্ঞতা পাব:

'আমরা করব জয়' We shall overcome

কাজের পরিকল্পনা শুরুর আগে আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত গানটি সম্পর্কে কিছু কথা জানব। যুগে যুগে এই গান পৃথিবীর সব দেশ, জাতি, সাদা-কালো, উঁচু-নীচুর ব্যবধান দূর করে সমস্ত মুক্তিকামী মানুষকে একত্র করেছে। এই গান পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় গাওয়া হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ সংকটকালে বারবার এই গান গেয়েছে নিজেদের উজ্জীবিত করার জন্য।

প্রথম দিকে প্রার্থনা সংগীত হিসেবে গাওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে কিছু গীতিকার একে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের অধিকার অর্জনের আন্দোলনে গণসংগীত হিসেবে রূপদান করেন।

বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে পিট সিগার গানের নবকল্পিত রূপ দেন। এসময় তিনি এই গানের কথার কিছুটা পরিবর্তন করেন। তিনি তাঁর নিজের দল দ্য উইভারসনের পক্ষ থেকে সিভিল রাইটস আন্দোলনের বহু সভা-সমাবেশ, Rally-তে গানটি পরিবেশন করে মুক্তিকামী মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেন।

ওয়াশিংটনে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের দাবির পক্ষে আন্দোলনে মার্টিন লুথার কিং-এর পদযাত্রায় এই গানটি গাওয়া হয়। যা পৃথিবীজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল এবং মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল।

জন হ্যারিস ১৯৬৫ সালে আফ্রিকার জোহান্সবার্গে জেলখানায় ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই গান গেয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, আয়ারল্যান্ড মানবাধিকার আন্দোলনে এই গান মানুষকে উজ্জীবিত করেছে এবং সাহস জুগিয়েছে। তাছাড়া গাজায় ইসরায়েলের ঘেরাওয়ের প্রতিবাদে এবং নরওয়েতে জঙ্গি হামলার পর মানবতাকামী মানুষের গলায় এ গান শোনা যায়। তিয়েন আনমেন স্কোয়ারের ছাত্ররা নিজেদের অধিকার বিষয়ে চীনা ভাষায় গেয়েছেন এই গান। তাছাড়া পরমাণু যুদ্ধবিরোধী ফরাসি নাগরিকদের কণ্ঠে এই গান ধ্বনিত হয়েছে শান্তিময় বিশ্বের আশায়।

হিন্দি ভাষায় 'হাম হোঙ্গে কামিয়াব একদিন' গানটি অনুবাদ করেন কবি গিরিজা কুমার মাথুর। যা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

বাংলাদেশের সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণকারী গণসংগীতের কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব হেমাঙ্গ বিশ্বাস বাংলায় এই গানের অনুবাদ করেন এবং নিজে পরিবেশন করেন। পরে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুবাদ এবং ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে গাওয়া বাংলায় 'আমরা করব জয়' গানটি বাংলার মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই গানের অন্য একটি অনুবাদ করেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যার শিরোনাম ছিল 'একদিন সূর্যের ভোর'। ১৯৭১ সালে রমা গুহ ঠাকুরতার তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা ইয়ুথ কোয়্যার গানটি রেকর্ড করে।

'আমরা করব জয়' We shall overcome এই একটি গান কীভাবে সারা পৃথিবীর মানুষকে মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে তা এই গানের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারলামপ্রথমে আমরা উপরে দেওয়া 'আমরা করব জয়' We shall overcome গানের বাংলা এবং ইংরেজি গানটির বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করব।

আমরা করব জয়

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

আমরা করব জয়, আমরা করব জয়!
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!
আহা বুকের গভীরে, আছে প্রত্যয়
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!
আহা বুকের গভীরে, আছে প্রত্যয়
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!
আমাদের নেই ভয়, আমাদের নেই ভয়!
আমাদের নেই ভয় আজ আর!
আহা বুকের গভীরে, আছে প্রত্যয়
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!
আমরা নই একা, আমরা নই একা!
আমরা নই একা আজ আর
আহা বুকের গভীরে, আছে প্রত্যয়
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!
সত্য যে সাথি, সত্য যে সাথি!
সত্য যে সাথি মোদের!
আছে মুক্তি নতুন, বক্ষ পাতি
সত্য যে মোদের সাথি
আমরা করব জয়! (আমরা করব জয়!)
আমরা করব জয়! (আমরা করব জয়!)
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই! (আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!)
আহা বুকের গভীরে, আছে প্রত্যয় (আহা বুকের গভীরে, আছে প্রত্যয়)
আমরা করব জয়! (আমরা করব জয়!)
আমরা করব জয়! (আমরা করব জয়!)
আমরা করব জয়! (আমরা করব জয়!)
আমরা করব জয় নিশ্চয়ই!

WE SHALL OVER COME

Pete Seeger

We shall overcome, we shall overcome
We shall overcome some day
Oh deep in my heart, I do believe
That we shall overcome someday
We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand
We'll walk hand in hand someday
Oh deep in my heart, I do believe
That we shall overcome someday
We shall live in peace, we shall live in peace
We shall live in peace someday
Oh deep in my heart, I do believe
That we shall overcome someday
We shall brothers be, we shall brothers be
We shall brothers be someday
Oh deep in my heart,I do believe
That we shall overcome someday
The truth shall make us free, the truth shall make us free
The truth shall make us free someday
Oh deep in my heart, I do believe
That we shall overcome someday
We are not afraid, we are not afraid
We are not afraid today
Oh deep in my heart, I do believe
That we shall overcome someday

- এবার গানটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজের চিন্তায় যে দৃশ্যকল্প তৈরি হয়েছে, তা নিজের মতো করে ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা দৃশ্যকল্প অনুযায়ী সাজিয়ে বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- এবার আমরা ঠিক করব, আমাদের এই ভাবনার দৃশ্যকল্পগুলোকে কীভাবে আমরা প্রদর্শন বা পরিবেশন করব। যাতে আমাদের প্রদর্শন বা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ভাবনার সঠিক প্রকাশ ঘটে।
- ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে যদি নিজের ভাবনাকে তুলে ধরতে চাই তবে আমাদের ভাবনার দৃশ্যকল্পের দৃশ্য পূর্ণাঙ্গ দুটি চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করব। এই ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র দৃশ্যকল্পগুলোকে কোলাজ আকারে অর্থাৎ অনেকগুলো দৃশ্যকে মোট দুটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরব।
- যদি আমরা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাই তবে আমাদের ভাবনার দৃশ্যকল্পগুলো প্রকাশ পায় তেমনি একটা গান আমরা পছন্দ করে নিজের মতো পরিবেশনের চেষ্টা করব। তবে গান পছন্দের ক্ষেত্রে ‘আমরা করব জয়’ We shall overcome পছন্দের গানটি বাদ রেখে নতুন কোনো গান পছন্দ করব।
- অভিনয় এবং নাচের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে দৃশ্যকল্পগুলোর মূলভাবকে প্রকাশিত করব। নাচের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাল বা গানের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবেশন করব।
- প্রত্যেকের প্রদর্শন এবং পরিবেশনের পরপর বন্ধুখাতায় লিখে রাখা দৃশ্যকল্পের লিখিত রূপটি সবার সামনে পাঠ করে শোনাব। এর সঙ্গে শ্রেণি শিক্ষক, সহপাঠীসহ সবার কাছ থেকে গঠনমূলক মতামত জানব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব:

- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা মতো ফুল, পাতার অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে ফুল, পাতা দিয়ে নকশা ও চিত্র রচনা (Composition) করার অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনামতো তেওড়া তাল এবং হ্মা- স্বরের ব্যবহারে সারগাম অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে নাচের এবং আঙ্গিকগত অভিনয়ের চোখের ভঙ্গিমা, ঘূর্ণনা অনুশীলন করব।
- পাঠ্যবইয়ে দেওয়া নির্দেশনা মতো ‘আমরা করব জয়’ কাজটি সম্পন্ন করব এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন বা উপস্থাপন করব।
- বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম ও সৃষ্টিশীল জগৎ সম্পর্কে আরো জানব।
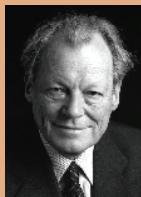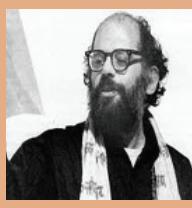
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

নবম শ্রেণি

শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য